KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সূর্যসেন স্ট্রীট, কল-১৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আবাবীল রহমান
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ২১/১ ২১/২ ২১/৩ ২১/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৫৫ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৫৫ কার্তিক - পৌষ ১৩৫৫ মাঘ - চৈত্র ১৩৫৫
	Condition : Brittle / Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

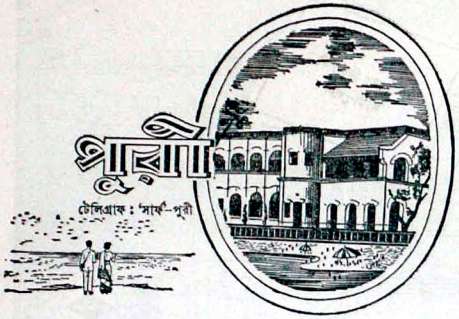

সোনারং বালুরাশি,
বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ,
অনন্তা বেলাভূমি,
আর
মহিমান্বিত মন্দির
··· এ সবই তো
পুরীর আকর্ষণ।
কিন্তু
পুরীতে
দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে হোটেলে
থাকার মতো
মনোরম বোধহয়
আর কিছু
নেই।

চমৎকার আহার্য ও বাড়ীর স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে হোটেল

নীল দিগন্তে
তরঙ্গায়িত পাহাড়,
উপত্যকার
প্রান্তে প্রান্তে
প্রকৃতির
আরণ্য সৌন্দর্য,
হ্রদ নির্ঝর ও
মনোরম
আবহাওয়ার
জন্যই রাঁচির খ্যাতি।
আর দক্ষিণ-পূর্ব
রেলওয়ে হোটেলের
চমৎকার আহার্য
ও স্বাচ্ছন্দ্যও রাঁচিকে
কম খ্যাতিমান
করেনি।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের পাবলিক্ রিলেসন্স্ অফিসার কর্তৃক প্রচারিত

SRI/PA/A

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** মাঘ-চৈত্র ১৩৬৬

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ৩৫৭
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ॥ অরূপ রতন ৩৬৬
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত ॥ জ্যোৎস্নার হরিণ ৩৬৮
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ নির্বাসন ৩৬৯
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ॥ চোখের আলোয় ৩৭০
ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ॥ শাপগ্রস্ত যযাতি ৩৭১
মনীশ ঘটক ॥ কনখল ৩৭২
অতীন্দ্রনাথ বসু ॥ নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ ৪০৩
সন্তোষকুমার ঘোষ ॥ হাই ৪১৭
অমলেন্দু বসু ॥ আধুনিক সাহিত্য ৪২৫
সমালোচনা—নরেন্দ্র দেব, লীলা মজুমদার, অচ্যুত গোস্বামী,
কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, সরসীকুমার সরস্বতী ৪৩৭

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ঐক্য

ও

সমন্বয়ের

সাধনায় ...

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের—বহুর মধ্যে সমন্বয়-সাধনের সফল সাধনাই আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষের মর্মবাণী। এই মর্মবাণীই নিহিত রয়েছে তার ব্যাপক, বিচিত্র, কখনও বা ভিন্নধর্মী সংস্কৃতি ও শিল্প-কলার মধ্যে।

হিমালয়ের যে পার্বত্য পৌরুষ বল্লম নৃত্যে উদ্দীপিত, সমতল-বাসিনী রসকলি-সাহিত তরুণীদের রাসনৃত্যে ও মৃদঙ্গের বোলে বা বাউল ও কীর্তনে তা স্তিমিত ও ভাবনত। উড়িষ্যার ছউ বা মধ্য ভারতের লাখাডি নৃত্যে, গুজরাটের গরবা বা দক্ষিণ ভারতের ভারতনাট্যম্ ও কথাকলি নৃত্যে এই বিচিত্র ভিন্নধর্মী সংস্কৃতিরই আত্মপ্রকাশ।

যোগাযোগ ব্যবস্থায় এই বিচিত্র, ভিন্নধর্মী সংস্কৃতির ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের প্রয়াসই রূপায়িত।

পূর্ব রেলওয়ে

একবিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

চতুরঙ্গ

মাঘ-চৈত্র ১৩৬৬

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

সোভিয়েট শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞানের কদরের কথা আগেই বলেছি। প্রাথমিক স্তরেই বিজ্ঞান শিক্ষা সুরু হয় এবং মাধ্যমিক স্তরে সমস্ত শিক্ষার্থীর জন্যই পাঠ্যক্রমের প্রায় অর্ধেক সময় বিজ্ঞানের জন্য নির্ধারিত। তার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে যে ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, না দেখলে তা বিশ্বাস করা কঠিন। সম্প্রতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে বিস্ময়কর প্রগতি, জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞানের প্রসার তার অন্যতম কারণ। শিল্পে, উদ্যোগে এবং জীবনযাত্রার মান বিচারে সোভিয়েট রাষ্ট্র আজও আমেরিকার তুলনায় পশ্চাৎপদ, ইয়োরোপের উন্নত রাষ্ট্রগুলিও এসব ব্যাপারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের অগ্রগামী, কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপক প্রসারে সোভিয়েট রাষ্ট্র বোধ হয় আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে। মিস্টার ক্রুশ্চভ বারবার ঘোষণা করছেন যে দশ পনেরো বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্র আমেরিকার সঙ্গে উৎপাদন বণ্টন ও ভোগের ক্ষেত্রে সমানভাবে পাল্লা দেবে—বিজ্ঞানের এ ব্যাপক প্রসারের ভিত্তিতেই তাঁর সে দাবী হয়তো সফল হতে পারে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে অল্পদিনের জন্য যাঁরা বেড়াতে যান, বিজ্ঞানের এ প্রাধান্য তাঁদেরও দৃষ্টি এড়ায় না। মস্কো শহরে একাডেমী অব সায়ান্স বা বিজ্ঞান একাডেমীর যে ইমারত ও বাগবাগিচা, তা দেখলেই এ কথা সহজে বোঝা যায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু ধরনের প্রতিষ্ঠান দেখেছি, কিন্তু যে ধরনের পরিবেশে যে অট্টালিকায় বিজ্ঞান একাডেমীর কেন্দ্রীয় অফিস অন্য কোথাও তার তুলনা মেলে না। বর্তমানকালের সমাজে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিকেরই যে প্রাধান্য তা বোঝাবার জন্যই যেন এ ব্যবস্থা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে বৈজ্ঞানিকদের বিষয়ে বলতে গিয়ে সাধারণ নাগরিকের কথায় যে মনোভাব প্রকাশ পায়, তাতে একদিকে যেমন শ্রদ্ধা অন্যদিকে তেমনি ঈর্ষার সংকেত রয়েছে। বৈজ্ঞানিকের স্থান যে বিশিষ্ট, সমাজে তাঁরা যে বিশেষ অধিকার ও মর্যাদার অধিকারী, এ বিষয়ে সাধারণ নাগরিক ও বৈজ্ঞানিক উভয়েই সমান সচেতন। বস্তুতপক্ষে বহুক্ষেত্রে সাধারণ নাগরিক যে সব বিষয়ে ভাবতেও দ্বিধা করেন, বৈজ্ঞানিক সেই সব বিষয়ে অসঙ্কোচে মতামত প্রকাশ করেন, এমন কি হাতে কলমে তা করতেও দ্বিধা করেন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁরা যে স্বাধীনতা

পেয়েছেন, জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও সে স্বাধীনতা দাবী করবার সাহস বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে মেলে বলে তাঁরাই হয়তো একদিন সোভিয়েট সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রূপান্তর নিয়ে আসবেন।

বিজ্ঞান বলতে আজকাল বহুদেশে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বোঝায়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কিন্তু সায়েন্স বা বিজ্ঞানের অর্থ সমস্ত বিষয়েরই বিশদ এবং সুসংবদ্ধ জ্ঞান। সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমীর মধ্যে তাই পদার্থবিদ্যা, রসায়ন বা গণিতের সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন প্রাচ্যবিদ্যা সব কিছুরই স্থান রয়েছে। মস্কোতে দর্শন পরিষদ বা ইনস্টিটিউট অব ফিলসফিতে দর্শন নিয়ে সদস্যদের সঙ্গে অনেক আলোচনা হল। প্রথমেই তাঁরা বললেন যে অন্যান্য দেশে দর্শনকে পরাবিদ্যা বলে বিজ্ঞানের সঙ্গে তার যোগ অস্বীকার করা হয়েছে, তাঁরা কিন্তু বিজ্ঞান একাডেমীর অংশ হিসাবেই দর্শন পরিষদ পরিচালনা করেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের মতে মার্কসবাদ বিজ্ঞানসম্মত দর্শন বিচার, তাই মার্কসবাদের দৃষ্টি ভঙ্গীতেই তাঁরা দর্শনের সমস্ত সমস্যার বিচার করতে উদ্যোগী। মার্কসবাদী হিসাবে তাঁরা কেবল সমস্যার বিচার ও বিশ্লেষণ করেই তৃপ্ত নন, বুদ্ধির সাহায্যে সমস্যার সমাধানই তাঁদের লক্ষ্য। পদার্থবিদ্যার সূত্র প্রয়োগ করে যেমন ব্যবহারিক জীবনের অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব, তাঁদের মতে মার্কসবাদের প্রয়োগে ঠিক সেইভাবেই ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধানও তেমনি সহজে হবে।

আমি প্রশ্ন করলাম যে দর্শন যখন কোন সিদ্ধান্তকেই শাশ্বত বলে মানে না, সমস্ত পূর্ব সিদ্ধান্তকে নতুন করে যাচাই করতে চায়, তখন মার্কসবাদের প্রতি তাঁদের এ অপ্রশ্ন অনুরাগ ও বিশ্বাসকে অদার্শনিক বললে অন্যায় হবে কি? উত্তরে তাঁরা বললেন যে মার্কসের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তকেই মানতে হবে একথা তাঁরা বলেন না, তবে মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী বৈজ্ঞানিক এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গীকেই তাঁরা স্বীকার করেন, কাজেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচার পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক বলা সঙ্গত নয়। আমি আপত্তি করলাম যে তাঁদের কথা মেনে নিলেও সন্দেহ মেটে না। মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গী বা বিচারপদ্ধতি যে বৈজ্ঞানিক, একথাও বিচার সাপেক্ষ এবং মার্কসের জীবদ্দশায় যে সব কথা তিনি বলেছিলেন, বর্তমান জগতে তার অনেক কথাই খাটে না। বিজ্ঞানের মূল সূত্রই হল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পূর্বজ্ঞানের সংস্কার এবং তার ফলে বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এবং পদ্ধতি দুই-ই বদলায়। তা ছাড়া বিজ্ঞান যে সব পদ্ধতি বা সিদ্ধান্ত অপ্রশ্নভাবে মেনে নেয়, দর্শন তাদেরও যাচাই করে, বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও দর্শনের বিচারের বিষয়, কাজেই দর্শন আলোচনার ক্ষেত্রে মার্কসের চিন্তাধারার বেলায়ও তাঁর সিদ্ধান্ত এবং পদ্ধতি দুই-ই নতুন করে বিচার করতে হবে। মার্কসের দৃষ্টি-ভঙ্গী বা বিশ্লেষণপদ্ধতি অপ্রশ্নভাবে মেনে নিলে তা সম্ভব নয়, ফলে দর্শন বিচারে বাধা আসবে। এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর তাঁদের কাছে পাইনি।

মার্কসবাদকে অপ্রশ্নভাবে গ্রহণ করায় যে সোভিয়েট দার্শনিকদের চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হয়েছে, তার নিদর্শন সহজেই মেলে। মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে অনেক তথ্যকে বিকৃত করে দেখা হয়, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষাপ্রণালীর উপরও তার ছায়া পড়েছে। মানুষের সমস্ত ক্রিয়াকলাপকে কেবলমাত্র ব্যবহারবাদ বা বিহেভিয়রিজম দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ মানুষ বহুক্ষেত্রে অভ্যাসের দাস হলেও কোন কোন স্থলে অভ্যাসকে অতিক্রম করে। প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অনুসারেই যদি মানব জীবনের সবকিছু ঘটত, তবে কর্তব্যবুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাধান্য এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা, এ সব কথার কোনই অর্থ থাকত না। সমস্ত কাজে এবং কথায়ই হয়তো পূর্ব অভ্যাসের খানিকটা প্রভাব রয়েছে, কিন্তু কেবলমাত্র

পূর্ব অভ্যাস দিয়ে মানুষের কর্তব্যবুদ্ধি বা স্বার্থত্যাগের কোন যুক্তিসঙ্গত বিবরণ দেওয়া চলে না। মানবসমাজের প্রগতি কিন্তু বুদ্ধির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বার্থকে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য বলিদানের ক্ষমতার ভিত্তিতেই সম্ভব হয়েছে। মার্কসের নিজের জীবন আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। অশেষ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও তিনি কোনদিন লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও মার্কসবাদের জড়বাদী দর্শনে মানব চরিত্রের এই বিশিষ্ট লক্ষণের কোন পরিচয় মেলে না।

মার্কসবাদকে অপ্রশ্নভাবে গ্রহণ করবার ফলে যে মানসিক বন্ধন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে বন্ধন ততটা ক্ষতিকর হয়নি বলে সোভিয়েট রাষ্ট্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত বা ধাতুবিদ্যার ক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে এগিয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে মানুষের প্রভাবকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করা হয়, প্রকৃতিকে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে দেখা হয় বলেই বোধ হয় তা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু মানুষের স্বভাব ও সমাজ নিয়ে যে সমস্ত বিজ্ঞানের কারবার, মানসিক এ বন্ধনের ফলে সে সমস্ত ক্ষেত্রে গত চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে তেমন কোন প্রগতির লক্ষণ দেখা যায় না। শুধু তাই নয়। চিন্তার এ বন্ধনের ফলে সাহিত্যক্ষেত্রেও নবনব উন্মেষশালিনী প্রতিভার বিকাশ আশানুরূপ হয়নি। শিক্ষার প্রসারে বর্তমানে সমাজের সমস্ত স্তরেই শিল্পী সাহিত্যিকের আবির্ভাব সম্ভব, কিন্তু তা সত্ত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্রের নামকরা দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক প্রায় সকলেই বয়সে পঞ্চাশের বেশী এবং প্রাক বৈপ্লবিক যুগের মানুষ। এ সম্বন্ধে সাহিত্য শিল্প সঙ্গীতের প্রসঙ্গে পরে আরো খানিকটা আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে।

দর্শন পরিষদে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দর্শন অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও গবেষণা নিয়েও আলোচনা হল। পাঁচ ভল্যুমে এক বিরাট পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাস তাঁরা রচনা করছেন, সে কথা বললেন এবং প্রথমে যে দুখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তা দেখালেন। প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষ এবং চীনের দর্শনের এবং দ্বিতীয় খণ্ডে ইয়োরোপের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের দর্শনের আলোচনা করা হয়েছে। বাকী তিনখণ্ড তখনো লেখা হয়নি। পরিষদের সভাপতি বললেন যে ভারত সরকারের উদ্যোগে *History of Philosophy : Eastern and Western* এই নামে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের যে ইতিহাস দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তার বিষয়-সমাবেশ ও আলোচনা পদ্ধতি সোভিয়েট দর্শন পরিষদের পরিকল্পিত ইতিহাসকে অনেকটা প্রভাবান্বিত করেছে। সোভিয়েট দার্শনিকেরা আমাদের গ্রন্থখানির অনেক প্রশংসা করলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনুযোগ করলেন যে রুশ দর্শনের পর্যাপ্ত আলোচনা আমাদের ইতিহাসে হয়নি। উত্তরে আমি বললাম যে একটি পুরো অধ্যায়ে মার্কসের চিন্তাধারার আলোচনা করা হয়েছে, প্লেটো বা কাণ্টের দর্শনের বেলায়ও এক অধ্যায়ের বেশী স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাছাড়া, লেনিনের চিন্তাধারার আলোচনাও গ্রন্থে মিলবে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত দার্শনিকই মার্কস এবং লেনিনের অনুগামী। তাই তাঁদের স্বতন্ত্র আলোচনা করিনি। আরো বললাম যে গত চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দর্শনের বিকাশ সম্বন্ধে কোন প্রামাণ্য প্রবন্ধ যদি পরিষদ আমাদের কাছে পাঠান, তবে দর্শন ইতিহাসের নতুন সংস্করণে আমরা সানন্দে তা প্রকাশ করব।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে দর্শন পরিষদ বিজ্ঞান একাডেমীর অন্যতম অঙ্গ। বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও নগরে প্রাচ্যবিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিও একাডেমীর অন্তর্ভুক্ত। মস্কো, লেনিন-গ্রাড এবং তাসকন্দে এ প্রতিষ্ঠানগুলি দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সোভিয়েট রাষ্ট্রে

শিক্ষার বিস্তার এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের ফলে সমস্ত দেশের সব রকমের বিদ্যা অর্জনের আগ্রহ বেড়েছে, কিন্তু এই বিরাট উদ্যমের মধ্যেও চিন্তার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের অবাঞ্ছনীয় বন্ধনের ইঙ্গিত মেলে। এককালে প্রাচ্যবিদ্যায়, বিশেষ করে সংস্কৃত, আরবী এবং ফারসী অধ্যয়নে মস্কো ও লেনিনগ্রাডের বিশ্ববিদ্যালয় অপূর্ব স্বীকৃতি লাভ করেছিল। ওলডেনবুর্গ চেরকস্কীর খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছিল। পাণ্ডিত্যের সেই নিষ্কাম নিরলস ও আত্মসমর্পিত ঐতিহ্য খানিকটা কমে এসেছে মনে হল, মনে হল যে বর্তমানে সোভিয়েট পণ্ডিতদের দৃষ্টি সাম্প্রতিক সমস্যার প্রতি বেশী আগ্রহশীল। মস্কোতে প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা শিক্ষার দিকেই বেশী ঝোঁক দেখলাম। হিন্দী, উর্দু এবং বাঙলা শেখবার ব্যবস্থা মস্কো এবং অন্যান্য কয়েক জায়গায় রয়েছে। মারাঠী এবং পাঞ্জাবী শেখবার ব্যবস্থাও সম্ভব হবে শুনলাম, সে তুলনায় সংস্কৃত আরবী ফারসীর সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থান নেই।

প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে সাক্ষাৎভাবে ভাষা শেখানোর চেয়ে ভাষাতত্ত্ব এবং বিদেশী ভাষা শিক্ষার পদ্ধতির প্রতি বেশী জোর দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরনের স্কুলে ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা নিয়েও নানা রকমের পরীক্ষা চলছে। সাধারণত শব্দতত্ত্ব শেখাবার পরে বর্ণমালা শেখানো হয়, তারপরে ব্যাকরণ এবং পাঠমালা। রাজনৈতিক গুরুত্বশালী কয়েকটি ভাষা শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার কথা আগেই বলেছি। তাদের বেলায় কেবল ভাষাই শেখানো হয় না, সেইসব ভাষার মাধ্যমে সমস্ত অধীত বিষয় পড়ানো হয় বলে সে সব স্কুলে ছাত্রছাত্রীরা ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে। সোভিয়েট পণ্ডিতেরা বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখেছেন, তার মধ্যে হিন্দী, উর্দু, বাঙলা, তামিল, মারাঠী এবং পাঞ্জাবী ব্যাকরণ উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে ভারতবর্ষে যে কাজ হয়েছে সে সম্বন্ধে সোভিয়েট ভাষাবিদরা সচেতন। ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বাঙলা ব্যাকরণ এবং ডঃ আর্যেন্দ্র শর্মার হিন্দী ব্যাকরণের খুব সুখ্যাতি শুনলাম। রুশ পণ্ডিতদের মতে তাঁরাই প্রথম আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যাকরণ লিখেছেন।

মার্কসবাদীর মতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের চেয়ে ব্যবহারিক জ্ঞানের মর্যাদা বেশী। মস্কোতে যে ভারতবর্ষের ক্লাসিকাল বা ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের চেয়ে আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের জন্য বেশী অনুরাগ, মার্কসবাদের প্রভাব তার অন্যতম কারণ। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েট নাগরিকদের জীবনে রাজনৈতিক শক্তি যে ভাবে সক্রিয়, বোধ হয় অন্য দেশে তার নজীর মিলবে না। মস্কোর তুলনায় লেনিনগ্রাডে বরং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রভাব স্পষ্টতর। মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে তাই বর্তমানে সংস্কৃত বা আরবী ফারসী ভাষা বা সাহিত্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি নেই, অবশ্য ভবিষ্যতে এ সমস্ত বিষয়ে কাজ করবার পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে এ কথাও শুনলাম, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক ভারতীয় ভাষা এবং ভারতবর্ষের গত তিনশো বছরের অর্থনৈতিক ইতিহাস নিয়েই সেখানে বেশী কাজ হচ্ছে। বিষয় নির্বাচন থেকেই তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়।

লেনিনগ্রাড রাজধানী নয় বলে বোধ হয় রাজনীতির দাবী সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ঝোঁকও সেখানে তাই বেশী মনে হল। বর্তমানে লেনিন--গ্রাডের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান মহাভারতের এক নতুন প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশ করছে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের এক প্রামাণ্য অনুবাদও সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্বের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে সংস্কৃতের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কমেছে মনে হল। ১৯৫৬ সালে যখন মস্কো

গিয়েছিলাম, তখন শুনেছিলাম যে লেনিনগ্রাড বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ বহুদিন অপূর্ণ রয়েছে। এবার যখন সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তখন শুনলাম যে মস্কো, লেনিনগ্রাড, কিয়েভ এবং তাসকন্দে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপকের ব্যবস্থা রয়েছে, কিন্তু ওলডেনবুর্গ বা চেরকস্কীর সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের অধ্যাপক ছিলেন, সে রকম চেয়ার-অধিকারী অধ্যাপক বর্তমানে কেউ আছেন কিনা, এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

সংস্কৃতের তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রে বরং আরবী ফারসীভাষা ও সাহিত্যের জন্য অনুরাগ বেশী মনে হল। আরবী এবং ফারসী এখনো অনেক দেশের রাষ্ট্রভাষা, কাজেই তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব সংস্কৃতের তুলনায় বেশী। সংস্কৃত একান্তভাবে সংস্কৃতির ভাষা। ভারতবর্ষেও তাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলেই বোধ হয় সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে সংস্কৃতের তুলনায় হিন্দীর প্রতি আগ্রহ বেশী। সোভিয়েট রাষ্ট্রে ফারসীর কদর সহজেই বোঝা যায়। বহু শতাব্দীর ইতিহাসের প্রভাবে এশিয়ার গণতন্ত্রগুলিতে এখনো ফারসী বহুক্ষেত্রে সংস্কৃতির ভাষা। যেখানে ফারসী রাষ্ট্রভাষা নয়, সেখানেও স্থানীয় ভাষার ফারসীর সঙ্গে মিল রয়েছে বলে সেখানকার বাসিন্দারা সহজেই ফারসী শিখে নেন। মস্কোর প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর ডঃ গফুরভ খানিকটা গর্বের সঙ্গেই বললেন যে ইরাণে ফারসীভাষা ও সাহিত্যশিক্ষার যে ব্যবস্থা, সোভিয়েট রাষ্ট্রের ব্যবস্থা তার তুলনায় কোন মতেই হীন নয়। তিনি একথাও বললেন যে শুধু আজ বলে নয়, বহুকাল ধরে মধ্য এশিয়ায় ফারসীভাষা ও সাহিত্যের চর্চা চলে এসেছে, ফারসীভাষার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই মধ্য-এশিয়াবাসী। সে প্রসঙ্গে ইবনে সিনা উলুগবেগ বা আর রাজীর নাম সহজেই মনে আসে। লেনিনগ্রাডে ফারসী পুঁথি ও গ্রন্থের সংগ্রহ খুবই সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে তার যে নতুন ক্যাটালগ তৈরী হচ্ছে, তা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থী ও গবেষকের খুবই কাজে লাগবে। লেনিনগ্রাডের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ফিরদৌসীর শাহ্‌নামার নতুন এক প্রামাণ্য অনুবাদ তৈরী করছে।

তাসকন্দের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানে ফারসী এবং তুর্কীভাষা ও সাহিত্য নিয়ে যে কাজ হচ্ছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ডিরেক্টর একজন মহিলা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রে যত বিদ্বজ্জনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের মধ্যে তাঁর স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কেবলমাত্র বিদ্যাবত্তায় নয়, স্বাধীনভাবে বিচার করবার শক্তিতেও তাঁকে খুবই উঁচু জায়গা দিতে হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে এবং বাইরের অন্যান্য দেশে আরবী ফারসীভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস নিয়ে যে কাজ হচ্ছে, সে বিষয়ে তাঁর গভীর অনুরাগ দেখলাম। আলবেরুণীর যে প্রামাণ্য সংস্করণ সম্প্রতি হায়দ্রাবাদের দায়রাতুল মারিফ প্রকাশিত করেছে, তার তিনি ভূয়সী প্রশংসা করলেন। একথাও অসঙ্কোচে স্বীকার করলেন যে বাবরনামা এবং গুলবদন বানুর আত্মকথার শ্রেষ্ঠতম সংস্করণ ভারতবর্ষেই প্রকাশিত হয়েছে। তাসকন্দে ইবনেসিনার রচনার প্রামাণ্য সংস্করণ ও প্রামাণ্য অনুবাদ নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। আর রাজীর একটি অপ্রচলিত রচনার উল্লেখ বহু জায়গায় মেলে কিন্তু ১৯৫৩ সালে তাসকন্দের পুস্তক সংগ্রহের ক্যাটালগ তৈরীর সময়েই তার পাণ্ডুলিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয়। ১৯৫৭ সালে যখন "রহস্যগ্রন্থ" নামে সে বইখানি প্রকাশিত হয়, তখন সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিত মহলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। বাবরের আত্মজীবনী তুর্কী সাহিত্যের অনুপম সম্পদ। খাস তুর্কী থেকে রুশ ভাষায় তার অনুবাদ হয়েছে এবং বর্তমানে তাসকন্দের প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান বাবরের চিঠিপত্রের খোঁজ করছেন। আলী শের নওয়াই বলে মধ্য এশিয়ার একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সঙ্গে বাবরের অনেকদিন

ধরে পত্রালাপ হয়েছিল। আলী শের নওয়াই বাবরকে যে সব চিঠি লিখেছিলেন, তার মুসাবিদা পাওয়া গেছে, কিন্তু বাবর তাঁকে কি লিখেছিলেন, তার খোঁজ আজো মেলেনি। বাবরের চিঠিপত্র এবং রচনার ভারতবর্ষে এবং আফগানিস্তানে আরো খোঁজ হওয়া প্রয়োজন, এ বিষয়ে তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমীর অন্যতম অঙ্গ গর্কী বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ। নাম শুনে প্রথমে ভেবেছিলাম যে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য অনুবাদই বুঝি পরিষদের প্রধান কাজ। কিন্তু আলাপ করে দেখলাম যে বিভিন্ন দেশের সাহিত্য নিয়ে গবেষণার জন্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে পরিষদের তরফ থেকে ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথমে ঠিক হয়েছিল যে ইতিহাস দু খণ্ডে রচিত হবে, প্রথম খণ্ডে আদি যুগ থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত ইংরাজি সাহিত্যের বিবরণ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে উনিশ ও বিশ শতকের বিশদ আলোচনা থাকবে। বই লিখতে গিয়ে কিন্তু এ পরিকল্পনা বদলে গেল। বর্তমানে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডে শেক্সপিয়র পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে শেক্সপিয়র থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের গোড়ায় রোমান্টিক যুগ পর্যন্ত সাহিত্যের আলোচনা মেলে। বাকী তিনখণ্ডে গত দেড়শো বছরের সাহিত্যের বিচার করা হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম যে ইংরাজি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ প্রথম দুখণ্ডে শেষ করে কেবল বিগত দেড়শো বছরের জন্য গ্রন্থের তিনখণ্ডের ব্যবহার কি যুক্তিসঙ্গত? গ্রন্থের সম্পাদক বললেন যে ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা উনিশ শতক পর্যন্ত ইংরেজি সাহিত্যের বিশদ বিবরণ লিখেছেন, তাই নতুন করে তার বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই। গত একশো দেড়শো বছরের ইতিহাসের সে তুলনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়নি, কাজেই সোভিয়েট পণ্ডিতেরা সেই দিকেই বেশী ঝোঁক দিয়েছেন। এ যুক্তি আমি পুরোপুরি মানতে পারিনি। আমার মনে হল যে ইংরাজি সাহিত্যে মার্কসবাদের প্রভাব বেশী করে দেখাবার জন্যই ইতিহাসের বিষয় এ ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। দেড়শো বছর আগে মার্কসের জন্মই হয়নি এবং গত একশো বছরেই তাঁর চিন্তাধারার প্রভাব ইংরাজি বা অন্য কোন সাহিত্যে মিলবে বলেই এই দেড়শো বছরের ইতিহাস এত বিশদভাবে লেখা হবে।

আমি বিশ্ব সাহিত্য পরিষদের অধ্যক্ষকে বললাম যে তাঁরা যে ইংরাজি এবং অন্যান্য সাহিত্যের এ ধরনের প্রামাণ্য ইতিহাস রচনা করছেন, এটা খুবই আনন্দের কথা। সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় একজন জার্মান, একজন ইংরেজ ও একজন ফরাসী পণ্ডিত যে সাধনা করেছেন, ভারতবর্ষ তা কোনদিন ভুলবে না। সেই প্রসঙ্গে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের এ ধরনের ইতিহাস রচনার কোন পরিকল্পনা বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় অধ্যক্ষ বললেন যে একাজ বিশ্ব সাহিত্য পরিষদের নয়, প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠান এ ধরনের কাজের জন্য দায়ী।

বস্তুতপক্ষে জীবনের সমস্ত প্রকাশকেই সংঘবদ্ধ করবার যে চেষ্টার পরিচয় সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাষ্ট্রে মেলে, বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী প্রভাব তার অন্যতম কারণ। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীতের ক্ষেত্রে তার কি ফল সে বিষয়ে পরে আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু দর্শন, প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষা ও সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাতে লাভ এবং লোকসান দুই-ই হয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী যে সমস্ত মূলসূত্রকে অপ্রশ্নভাবে স্বীকার করে নেয়, দর্শন সেগুলিকেও বিচার ও বিশ্লেষণ করতে চায়। কাজেই দর্শনের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ করলে দর্শন বিচার সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ভাষাতত্ত্বের বেলায় বৈজ্ঞানিক বিচারে লাভ

ছাড়া লোকশান নেই, কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের বিচারে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সর্বত্র সফল হয় না। সোভিয়েট রাষ্ট্র কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানকে ধর্মবিশ্বাসের মতন আঁকড়ে ধরেছে। উনবিংশ শতকের শেষে পশ্চিম ইয়োরোপ যেভাবে বিজ্ঞানের পূজা করেছে, আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার পুনরাবৃত্তি চলছে বললে অন্যায় হবে না।

বিজ্ঞানের যেখানে এত কদর, সেখানে যে বৈজ্ঞানিকের সামাজিক মর্যাদা অসাধারণ হয়ে দেখা দেবে তা সহজেই বোঝা যায়। বস্তুতপক্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রে সাধারণ নাগরিকের পক্ষে বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্য হওয়ার চেয়ে বড় সম্মান বোধ হয় আর কিছুই নেই। রাষ্ট্রক্ষমতা যাঁদের হাতে, কম্যুনিস্ট পার্টির সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের কথা আলাদা। তাঁদের বাদ দিলে বাকী সোভিয়েট নাগরিকদের মধ্যে বৈজ্ঞানিকের স্থান সর্বোচ্চ বললেই অত্যুক্তি হবে না। বিজ্ঞান একাডেমীর যাঁরা পূর্ণ সদস্য, তাঁরা যে কেবল সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তা নয়, আর্থিক স্বচ্ছলতার এবং জীবনযাত্রার বিভিন্ন প্রয়োজনের দিক থেকেও তাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রে অগ্রণী।

বিজ্ঞান একাডেমীর সদস্যপদ লাভের জন্য সোভিয়েট মনীষীদের আগ্রহ তাই সহজেই বোঝা যায়। আমি যে সময় মস্কো গিয়েছিলাম, তখন একাডেমীর পূর্ণ সদস্যদের সংখ্যা ছিল ১৫২। পূর্ণ সদস্য ছাড়াও করেসপণ্ডিং মেম্বার রয়েছেন। তাঁরা সদস্যদের কতগুলি সুযোগ সুবিধা পান, কিন্তু একাডেমীর পরিচালনায় তাঁদের কোন হাত নেই। অনেক ক্ষেত্রে যাঁরা রাষ্ট্রীয় একাডেমীর পূর্ণ সদস্য, তাঁরা সোভিয়েট একাডেমীর করেসপণ্ডিং মেম্বর। সাধারণত এই সমস্ত করেসপণ্ডিং মেম্বারদের মধ্য থেকেই পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু একেবারে পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তারও নজীর রয়েছে। পূর্ণ সদস্যের কোন বাঁধাধরা সংখ্যা নির্ধারিত নেই। তা বাড়তে কমতে পারে। পূর্বে প্রতি তিন বছরে একবার সদস্য নির্বাচন করা হত। বর্তমানে একাডেমীর সভাপতিমণ্ডলী প্রতি বৎসর স্থির করেন যে কতজন সদস্য নির্বাচন করা হবে। পূর্বে বৎসরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের কার্যক্রম কতখানি সফল হয়েছে এবং পরের বছর বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে কতখানি উৎসাহ প্রয়োজন—এই দুটি কথা বিচার করে কতজন সদস্য নির্বাচন করা হবে তা স্থির করা হয়। নির্বাচন প্রণালী ভাল করে বোঝাবার জন্য একাডেমীর জনৈক কর্মকর্তা বললেন যে বর্তমানে পলিমার কেমিস্ট্রির ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন তাই সাতজন পলিমার কেমিস্টকে একাডেমীর সদস্য নির্বাচন করবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আমি বললাম যে নির্বাচনের যে পদ্ধতি, তাতে বিভিন্ন বিজ্ঞানের সদস্যদের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা কঠিন মনে হয়। বিশেষ কৃতিত্বের জন্য যিনি নির্বাচিত হবেন, এবং যাঁকে উৎসাহ দেবার জন্য নির্বাচন করা হবে, এ দুজনের মধ্যে তুলনা হবে কি ভাবে? শুধু তাই নয়, উৎসাহ দেবার ভিত্তিতে কাউকে নির্বাচন করলে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা এড়ানো কঠিন, সভাপতিমণ্ডলীর পছন্দ অপছন্দের উপর অনেকখানি ফলাফল নির্ভর করবে। একাডেমীর কর্তৃপক্ষেরা এসব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারেন নি, কিন্তু একথাও তাঁরা স্বীকার করতে চান নি যে সদস্য নির্বাচনে পক্ষপাতিত্বের কোন সম্ভাবনা আছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের যে প্রসার, এবং শুধু দেশের অভ্যন্তরে নয়, সারা পৃথিবীতে সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের কাজের যে ভাবে যাচাই হয়, তাতে কার্যত হয়তো তাঁদের কথাই ঠিক, কিন্তু তবু পক্ষপাতের সম্ভাবনা খানিকটা থেকে যায়, একথাও অস্বীকার করা চলে না।

একাডেমীর সমস্ত শাসনভার সভাপতিমণ্ডলের উপরে ন্যস্ত, কাজেই সভাপতি-

মণ্ডলের সংগঠন সম্বন্ধে স্বভাবতই কৌতূহল জাগে। সভাপতিমণ্ডলেরও একজন সভাপতি ও তিনজন সহ-সভাপতি রয়েছেন। বিভিন্ন বিষয়ের জন্য পাঁচজন সম্পাদক, সমস্ত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত সাতজন সদস্য এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় একাডেমীর চারজন প্রতিনিধি আরো চারজন একাডেমীসিয়ান এই পঁচিশজন সদস্য নিয়ে সভাপতিমণ্ডল গঠিত। সভাপতি-মণ্ডলের সদস্যেরা সাধারণত তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হন, কিন্তু সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদের নির্বাচন পাঁচ বছরের জন্য। পূর্বেই বলেছি যে করেসপণ্ডিং মেম্বরদের একাডেমীর পরিচালনায় কোন হাত নেই কাজেই কেবলমাত্র পূর্ণ সদস্যদের মধ্য থেকেই সভাপতিমণ্ডলের সদস্য নির্বাচন করা হয়।

সভাপতিমণ্ডলের যিনি সভাপতি, তিনিই প্রধান কর্মকর্তা। সোভিয়েট রাষ্ট্রের মন্ত্রী-সভার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে তিনি কাজ করেন, কার্যত বলা চলে যে সোভিয়েট রাষ্ট্রের প্রধান-মন্ত্রীর কাছেই তাঁর কাজের জবাবদিহি হয়। একাডেমীর বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠলে মন্ত্রী-সভার বৈঠকে তাঁর ডাক পড়ে। তিনি উপস্থিত হয়ে একাডেমীর কথা মন্ত্রীসভার সামনে পেশ করেন, কিন্তু আলোচনায় যোগ দেবার সুযোগ থাকলেও মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তে তাঁর কোন অধিকার নেই। যদি মন্ত্রীসভায় কখনো ভোটের কোন প্রশ্ন ওঠে, তবে একাডেমীর সভাপতি সেখানে কেবলমাত্র দর্শক। তা ছাড়া মন্ত্রীসভার অদল বদল হলেও বিজ্ঞান একাডেমীর সভাপতিমণ্ডলের বা মণ্ডলের সভাপতির কোন পরিবর্তন হয় না। কাজেই বলা চলে যে ভারত সরকারের ব্যবস্থায় কেবিনেট সেক্রেটারীর যে পদমর্যাদা ও স্থান, সোভিয়েট রাষ্ট্র একাডেমীর সভাপতির পদমর্যাদা ও স্থান তার সঙ্গে তুলনীয়।

পূর্বেই বলেছি যে সোভিয়েট একাডেমী ছাড়াও প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে স্বতন্ত্র একাডেমী রয়েছে। এ সমস্ত একাডেমীর বেলায়ও পূর্ণ সদস্যেরাই সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু করেসপণ্ডিং মেম্বাররাও কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পান। বিশেষ করে পূর্ণ সদস্য হবার জন্যও করেসপণ্ডিং মেম্বর হওয়া বহুক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। কিয়েভে যখন গিয়েছিলাম, তখন সেখানে এক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সভা হচ্ছিল বলে উক্রেনিয়ার একাডেমী দেখার সৌভাগ্য হয় নি। কিন্তু তাসকন্দে উজবেকীস্তানের একাডেমীতে সেখানকার সদস্যদের সঙ্গে অনেক আলাপ হল। ১৯৪৩ সালে উজবেকিস্তানের একাডেমী প্রতিষ্ঠিত হয়। বোধহয় মহাযুদ্ধের সময় বিজ্ঞানের প্রসারের প্রয়োজন বেড়ে গিয়েছিল বলেই স্বতন্ত্রভাবে তার প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে একাডেমীর ২৮ জন পূর্ণ সদস্য এবং ৩৫ জন করেসপণ্ডিং মেম্বর। সভাপতি এবং একজন সহ-সভাপতি এই দুজন সোভিয়েট একাডেমীর করেসপণ্ডিং মেম্বর এবং শুনেছিলাম যে সভাপতি সম্বরই সোভিয়েট একাডেমীর পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হবেন। এ বছর জানুয়ারী মাসে ভারতীয় সায়ান্স কংগ্রেসের সময় শুনলাম যে তিনি এখন সোভিয়েট একাডেমীর পূর্ণ সদস্য—উজবেকিস্তানের আর কোন বৈজ্ঞানিক পূর্বে এ সম্মান লাভ করেন নি।

সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমীর ১৫২ সদস্যের মধ্যে ত্রিশ জন ছাড়া বাকী সবাই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানবিদ। পদার্থবিদ্যা ও গণিতে যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী, সমস্ত সদস্যর তাঁরা এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী। যে ত্রিশজন একাডেমিশিয়ান সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি মানবিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত, তাঁদের মধ্যে ঐতিহাসিকরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। সোভিয়েট একাডেমীতে এ সমস্ত মানববিদ্যা বিশারদ তবু প্রায় এক পঞ্চমাংশ, উজবেকীস্তানের একাডেমীতে তাঁদের সংখ্যা আঠাশ জনের মধ্যে মাত্র দুজন।

মস্কো এবং তাসকন্দ দুই সহরেই আমি এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছি। মানববিদ্যায় যাঁরা

অনুরাগী তাঁদের সংখ্যা এমনিতেই কম, কাজেই তাঁদের পক্ষে ভবিষ্যতে একাডেমীর সদস্য নির্বাচিত হওয়া দিন দিন আরো কঠিন হয়ে উঠবে। একাডেমীর কর্তৃপক্ষেরা একথা মানতে চাননি, বলেছেন যে সদস্য নির্বাচনের যে পদ্ধতি, তাতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে মানববিদ্যার সমান সুযোগ মিলবে। একাডেমীর সদস্য ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিজ্ঞান পরিষদ, সাহিত্য প্রতিষ্ঠান বা দর্শন সংস্থা সদস্য নির্বাচনের জন্য নাম প্রস্তাব করতে পারে। সোভিয়েট একাডেমীর বেলায় বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় একাডেমীরও নাম প্রস্তাবের অধিকার আছে। নির্বাচনের প্রায় দু মাস আগে সমস্ত প্রস্তাবিত নামের লিস্ট গেজেট এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন প্রার্থীর যোগ্যতা নিয়ে প্রকাশ্য-ভাবে এবং গোপনে অনেক আলোচনা হয়। সভাপতিমণ্ডলীর সামনে যে সমস্ত আলোচনা বিতর্ক পেশ করা হয় এবং গোপন বৈঠকে সভাপতিমণ্ডলী তাঁদের মধ্য থেকে নির্ধারিত সংখ্যার নাম সাধারণ সভায় পেশ করেন। সাধারণ সভা সে সমস্ত প্রস্তাব ইচ্ছা করলে অগ্রাহ্য করতে পারে, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম যে সভাপতিমণ্ডলের প্রস্তাবিত নাম বোধ হয় কখনো বাতিল হয়নি।

বর্তমানে সোভিয়েট বিজ্ঞান একাডেমীর তরুণতম সদস্য সারাজভ। তিনি পদার্থবিদ এবং ৩১ বৎসর বয়সেই তিনি একাডেমীর পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হন। এখনো তাঁর বয়স চল্লিশ বৎসর হয়নি। প্রাচীনতম যিনি সদস্য তাঁর বয়স কিন্তু নব্বুই পেরিয়ে গিয়েছে। কাজেই একাডেমীতে প্রবীণ ও তরুণের এক অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়। একাডেমীর প্রভাব কেবল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, মানবিক মূল্যায়ন এমন কি রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপরেও তার প্রভাব সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে দিন দিন বাড়ছে মনে হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ রচনার কল্পনাও তার অন্যতম ফল বললে অন্যায় হবে না।

[ক্রমশঃ]

কবিতা

অরূপ রতন

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

রং নেই কোন, রূপ নেই কোন,
জ্বরে বার্লির স্বাদের মতন
দিন ঝরে যায় চোরা কান্নায়,
হায় রে মেলে না অরূপ রতন।

চোখের বাইরে সুঠাম সকাল
তাজা রোদ্দুরে ফেরি করে যায়,
দিনে-আলো-জ্বালা ঘরে ফাইলের
কালো অক্ষরে দুপুর গড়ায়।

লাল সোনালির সন্ধিতে রাঙা
তন্বী বিকেল ত্বরিত-চরণ
ছায়া এঁকে যায় সাঁঝ-সীমানায়
মেদুর মায়ায় শব্দহরণ।

সন্ধ্যা গড়ায় রাত্রির পায়,
গতযৌবনা গণিকার মতো
চাঁদ পড়ে থাকে চোখের বাইরে,
খোরাসানী রাত ব্যথা-বিক্ষত।

রাত-জাগা কোন বেহুলা-পাখির
রোদনে জাগে না মৃত যৌবন,

রাত কেটে যায় শিলা-নিদ্রায়,
শ্লথ অচিকণ কবির স্বপন।

বাতাস আনে না কোন বন থেকে
অনামী ফুলের সুরভি মদির,
অন্ধকারের গন্ধ ছড়ানো
পঙ্গু গলিতে শহরতলীর।

গলির প্রান্তে হাইড্রাণ্টেই
গঙ্গোত্রীর সংস্করণ
দেখে দিন যায় চোরা কান্নায়,
হায় রে মেলে না অরূপ রতন।

জ্যোৎস্নার হরিণ

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

হে স্বপ্ন, হরণ করো ঐ রক্ত-মাংসের পিণ্ডকে;
গাঢ় অন্ধকার নাচে জিহ্বায় যেমন,
বক্ষে, ম্লান বাহুমূলে, কঠিন কঙ্কনে, অনুরূপ
কৃতঘ্নের ঘৃণা ঝরে—অস্তমান সূর্যে, চন্দ্রোদয়ে।
প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে জ্যোৎস্নার হরিণ,
ঘুমের ভিতর তাকে স্পর্শ ক'রে, স্বপ্নের ভিতরে
প্রতিনিয়তই যেন শোনা যায় বিতাড়িত পাখির চিৎকার।
মনেও পড়েনা আর নাম, প্রতিধ্বনি, প্রতিধ্বনিত চুম্বন!

উদ্ভিদ পেয়েছে তার উত্তরাধিকার।
দুজনেরও দাঁড়াবার মতো যেন জমি নেই, এমনি আগাছা
ঘিরেছে স্থিতির কেন্দ্র, কেন্দ্রচ্যুত সোনালি কিরণে
রামধনুকের ছিলা কেঁপে যায়, দৃশ্যপটে কাঁপে রূপান্তর।
এইতো ছিলেন, কিংবা ঐতো রয়েছে—সব, সবই চিত্রবৎ
হয়ে যায়—হাতে-আঁকা, সংক্ষিপ্ত, রঙিন ভূমণ্ডলে!

ফুঁ-দিয়ে ওড়াও ধুলো, অণু-পরমাণুর নিক্কণ;
দিনের ওপর দিয়ে দ্রুত হেঁটে, রাতে অন্যমনে,
সবুজ রঙের এক নিস্তব্ধ নগরে
পাগলের মতো খোঁজো যোগ্য অন্বেষণের জানালা,
যেখানে দুচোখ রেখে ষড়ঋতু কাটানো সহজ,
তথাপি সহজ নয় জীবনযাপন
চতুর্দিক-মধ্যরাত্রে, যখন মানুষ ব'লে কেউ নেই পথে ও প্রান্তরে;
প্রান্তরে, জ্যোৎস্নায়, দূরে, সন্নিকটে,—হরিণ—হরিণ।
ঘুমের ভিতরে তাকে স্পর্শ ক'রে, স্বপ্নের ভিতর...
হয়ে যায় চিত্রবৎ—হাতে-আঁকা, সংক্ষিপ্ত, রঙিন ভূমণ্ডলে!

নির্বাসন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

বারবার ভেঙে যায় নীল সংঘ, সমস্ত দৃশ্যের মূল বিভা
অন্তহীন ধ্বনি ওঠে তীব্র কণ্ঠে না না না না না না
না লোভ, না স্মৃতি, তৃপ্তি, না প্রেমের অমর প্রতিভা
বারবার ভেঙে যায় রক্তের ধারক এই শরীরের সুখের সীমানা।

কি বিদ্রোহে মত্ত আছি, মন্ত্রজিহ্বসম নির্বিকার সিন্ধসাজে
আলো কিংবা অন্ধকার সমার্থক এক বর্ণে কেঁপে কেঁপে ওঠে
একটি সূর্যমুখী ফুল ঝরে গেলে লক্ষ বৎসরের দুঃখ বাজে
স্বয়ং সূর্যেরও মুখ কখনও বা মুছে যায় মেঘ বৃষ্টি ঝড়ের সংকটে।

আমার দুঃখেরা আজ দেবতার আসনে বসেছে। অমলিন
রৌদ্রের পার্থিব চিহ্ন কে তাঁদের মসৃণ ললাটে, ভ্রূ-সন্ধিতে
এঁকে দিয়ে গেছে, আমি শৃঙ্খল আবদ্ধ নতজানু, কীর্তিহীন
দণ্ডিতের মত বসে আছি। কোন্ অনির্দিষ্ট দূর রাজ্যে নির্বাসন দিতে
এসেছে প্রহরীবৃন্দ,—কোথাও বাজেনা ক্ষীণ প্রতিবাদ ধ্বনি
যেদিকে তাকাই শুধু শুভ্র শান্তি, প্রৌঢ় হিম অমোঘ শূন্যতা
ধুলায় লুণ্ঠিত নেই আকুল-মুখর্দ্বজা কোন' রোদসী রমণী,—
সন্ধ্যার করুণ রশ্মি নেমে আসে, যেন কাঁপে লক্ষ দ্রাক্ষালতা।

অবিশ্বাস, অতৃপ্তির অপ্রেমের স্থির অন্ধকারে ডুবে থেকে
আমার বিদ্রোহী আত্মা যেন পুনর্বার জাগে শিল্পের উজ্জ্বল অভিষেকে।

চোখের আলোয়

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

গাছে গাছে ফুর্তি, বহে তীব্র হাওয়া দক্ষিণে প্রবল।
ঊর্ধ্বের বিস্তৃত নীলে চিত্রশিল্পী কিছু খণ্ড মেঘ
ছবি নিয়ে ভেসে যায়। আরো কাছে, ছায়ার নির্জনে
আয়ুর দুর্লভ মুক্তি—দুহাতে প্রতিমা হওয়া তোমার শরীর।

কারা দূরে চলে যাচ্ছে বয়সে যৌবন নেই বলে,
ঐ কারা চিরদিন চেনা চোখে দেখে গেল যুগ্মতার ছবি;
কোথায় পবিত্রঘণ্টা অবিরাম রক্তে গাঢ় বাজে
ধ্বনির বোধনে শব্দ, স্মৃতি হবে সময়ের আচ্ছন্ন পিপাসা—

গাছে গাছে ফুর্তি বহে তীব্র হাওয়া চঞ্চল চঞ্চল।

এখন দিগন্ত দূরে পশ্চিমের শ্রদ্ধাবান আলো
দেখে দুটি স্বচ্ছ মুখ দক্ষিণের তীর্থে চেয়ে আছে;
একটি রক্তাক্ত পদ্মে আশীর্বাদি দশটি আঙুল
তোমার রূপের স্বর্গে বুক যার জ্বলেছিল ধূপে।
কারা দূরে চলে যাচ্ছে! আমাদের ক্লান্ত কতো পিতামহ দিন
শুধু বেঁচে, মরে গেছে। তারপর একদিন তুমি
চোখের নিসর্গ থেকে বুকে এসে দাঁড়ালে প্রতিমা।
—আপাতত দেখ পাশে জমে উঠছে দর্শক আঁধার,
কি প্রগাঢ় খুসী নড়ছে বৎসল গাছের সব শুভার্থী পাতায়।

আমার আয়ুর কাছে অস্তিত্বের শেষ শিল্প, প্রেম;
এবং জয়তী তুমি, চোখের শ্রদ্ধার উৎস রাজেশ্বরী আলো॥

শাপগ্রস্ত যযাতি

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

অযৌবন-আক্রান্ত দেহ কাকে দেব?
আকুল অবনীতল বসন্তের গাঢ় জ্যোৎস্নারাতে,
আত্মপুত্র কে আমার, যৌবনসন্ন্যাসী,
মমতারহিত প্রিয়কারী।
কে আমার শুদ্ধ ফলশ্রুতি?

বিশ শতাব্দীর জরা যৌবনের অল্পের ভিতর
কাকে দেব?
ফিরে পেতে বিশ্বাচীর সহাস ফেনিল করতল,
ফিরে পেতে অনঘ অন্তর।

কে রয়েছো রক্তের ভিতর? তৃষ্ণার ভিতর কার কণ্ঠস্বর
যাচ্ঞা করে সহস্র ফাল্গুন,
অপ্রাপ্তযৌবনধন মেগে নিতে চায় নুব্জ নহুষতনয়!

শিরা উপশিরা ডাকে, কোষে কোষে আকুল প্রার্থনা,
ঘন বসন্তের বনে মেরুশৃঙ্গে অলকায় নন্দনকাননে
যৌবনের পুনর্ভোগ চায়;
কামনার তৃপ্তি কামনায়!

কে নেবে যৌবন-জরা, কে আমার প্রিয়কারী পুরু?

কনখল

মনীশ ঘটক

কনখলের মনের সদরের খোলা কপাট দিয়ে হিড় করে আসে একটির পর একটি নতুন দিন। প্রতিটি প্রাতঃকাল ওর কাছে বিস্ময়কর আবির্ভাব। পূবে জলপাইবনের মাথায় মাথায় কে যেন সোনায় সবুজে গোলা কচি রোদ্দুরের পিচকিরি ছুটিয়ে দেয়, নাম না জানা একরাশ পাখির কলকাকলি শিশির ভেজা সদ্যচোখমেলা দিনটিকে শশব্যস্ত করে তোলে, ওর ঘুমের জড়তা পলকে কেটে যায়। বিছানা থেকে ওঠে, আড়মোড়া ভেঙে নয়, তড়াক করে লাফ দিয়ে। চোখেমুখে জল দিতে ছোটে, ধীর পদক্ষেপে নয়, প্রায় দৌড়ে। দক্ষিণে, কয়েকখানা বাড়ীর পরেই ব্রাহ্মমন্দির। সেখান থেকে সমাজের আচার্য পরেশবাবুর স্তবগম্ভীর সুর ভেসে আসে,

—তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর, তুমি তাই এসেছ নিচে,—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।

মানে বোঝে না কনখল, কিন্তু সুরে সুর মিলিয়ে আপন মনে ঐ দুটি লাইন গাইতে থাকে। বুকের ভিতর একটা দিক যেন ফাঁকা ছিল, কথাগুলো আউড়ে গেলেই সে দিকটা যেন ভরে ওঠে।

ও জানে, মা আরো আগে উঠে ভাঁড়ার ঘরের যে কোনটায় পিতলের ছোট্ট পালঙ্কে যে ছোট্ট নাড়ুগোপাল মূর্তিটি আছে, সেইখানে প্রণাম করতে গেছেন। রোজ করেন। সন্ধ্যেবেলা আবার তেলের পিদিম দেন, ওখানেও, তুলসী তলায়ও। টিলার বাড়ীতে তুলসীতলা ছিল না, কিন্তু মার শোবার ঘরের এক কোণে নাড়ুগোপাল ছিল।

মুখধোবার পর নিত্যকর্মের প্রথম দফা, আস্তাবলে হাজিরা। ঘোড়ায় চড়ে রোজ টহল দিতে বেরোনর সুবিধে হয় না, তা না হোক। হারুণ কাঞ্চনকে দলাই মলাই করে, পুরু শক্ত বুরুশ দিয়ে ঘাড় গর্দানা ঝেড়ে দেয়। প্রত্যেকটি পা ভাঁজ করে ধরে নাল ঠুকে দেখে ঢিলেঢালা হয়ে গেল কিনা। সন্দেহ হলে পুরোনো পেরেক বার করে নতুন পেরেক লাগায়। কনখলের ভয় হয় বুঝি পায়ের মাংসে ঢুকে যাবে। তা যায় না। হারুণের হাত খুব দোরস্ত, পেরেক লাগানোর পর বাটালি দিয়ে পায়ের খুর চেঁচে সমান করে দেয়। কাঞ্চন কনখলকে দেখামাত্র ঘাড় বেঁকিয়ে তলার ঠোঁট কাঁপিয়ে একপাশের দাঁত বার করে আদর সম্ভাষণ জানায়,—যেন মুচকি হেসে বলতে চায়,—ভাবছ লাগছে বুঝি? একটুও না। আমরা ঘোড়ারা এসব পেরেক বাটালির ঠুকঠাক কেয়ারই করি না। কনখল গিয়ে মুখের কাছে দাঁড়ায়। কাঞ্চন ওর মাথায় গাল ঘসে দোস্তি জানায়। দু হাত দিয়ে ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে গালে গাল রাখে কনখল।

বাড়ীর দিকে ফিরতে খানাকামরার জানলায় উর্দিপরা রহমতের চেহারা নজরে পড়ে। বুড়ো কেমন নিঃশব্দে ঘোরাফেরা করে দেখে তাক লাগে কনখলের। এই মেজের ওপর পিরীচ-পেয়ালা সাজাচ্ছে, আবার একটু পরেই কোমরবন্ধে আঁটা ঝাড়ন দিয়ে কাঁটা চামচ সাফ করছে। টুক করে বাবুর্চিখানা থেকে ধোঁওয়া ওঠা ডিমের ডিস নিয়ে আসছে—আবার একটু পরেই, একহাতে আংটা আঁটা টোস্টদান, আরেক হাতে প্লেট বসানো ঘেরাটোপ ঢাকা চায়ের কেৎলী

আনছে। পা ফেলছে আলগোছে যেন সার্কাসের তারের ওপর দিয়ে হাঁটবার খেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু মজা হল, বাবা এসে টেবিলে বসলেই বুড়ো এক কোণে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে, যেন সেও একটা ঘরের আসবাব। এটা ওটা খাবার তুলে দেওয়া এগিয়ে দেওয়া এসব মা করবেন। কেবল বাবা ঘাড় ফেরালে ও এসে নিঃশব্দে বাঁ পাশে দাঁড়াবে, হুকুম শুনে আবার তেমনি নিঃশব্দে তামিল করতে ছুটবে। এসব আদবকেতার ওর আর নড়চড় নেই।

ভাব হয়ে যাবার পর ব্যাঙা আজকাল উঁকিঝুঁকি দেয় রোজ বিহানে। ও গিয়ে ব্যাঙার মাথায় তিনটে চাঁটি কসিয়ে দেয়, বলে,—এখন পড়ব। পরে আসিস। ব্যাঙাও ইচ্ছে করলে চাঁটি ফিরিয়ে দিতে পারে, কেন যে দেয় না, সেই জানে। দিলে কনখল অসুখী হত না, পারত লাগাতে একটা চুলোচুলি। দেখিয়ে দিত ওকে অমৃত-র কাছে শেখা জুলপীর চুল উলটো টান দেবার কসরতটা—যা লাগা লাগে। নিজে কিন্তু গুরুবাক্য ভোলে নি,—প্র্যাকটিস মেকস ম্যান পারফেক্ট। নিজের জুলপী উলটো টেনেও না-লাগা—নেহাৎ লাগলেও কম লাগা—অভ্যাস করে নিয়েছে। বলা ত যায় না—কখনো কোন মাস্টার আচমকা যদি টেনেই দেয়!

চাঁটি হজম করে মাথা ঝাঁকিয়ে ব্যাঙা ছুট দেয় আস্তাবল মুখো। জেল থেকে ওর বাবা না ফেরা পর্যন্ত ওকে আস্তাবল ঝাঁটপাট করবার কাজ দিয়েছেন নিভাননী। সে কাজ সুরু করবার পর থেকেই ব্যাঙা ওর সাথে সমানে সমানে হাতাহাতি করা কমিয়ে এনেছে। ইস্কুলে যায় না কিনা, তাই গাধাটার ইঁট খেলে পাটকেল ছোঁড়ার বিদ্যে রপ্ত হয়নি আদপে। মাকে বলে ওকে ভর্তি করাতে হবে স্কুলে, তা হলেই ঢিট্ হয়ে যাবে বাছাধন।

একটু পরেই মার ডাক শোনা যায়। হাসিমুখে বারান্দায় এসে দাঁড়ান তিনি।

—কংখ, খাবি আয়।

দরকার নেই, তবু মা ডাকেন। জানাই আছে এখন খেতে হবে, কোনদিন ভুল হয় না। তবুও রোজ ডাকবেন মা। ছুট দেয় কনখল। মার গায়ে মাথামুখ ঘসে শাড়ীর আঁচল দুলিয়ে দিয়ে খাবার টেবিলে এসে শিষ্টশান্ত হয়ে বসে। বাবা আগেই এসে বসে গেছেন।

ডিম, টোস্ট, রাতের বাসি রোস্টের টুকরো, এসবে কনখলের যতটা আসক্তি, গেলাস-ভর্তি দুধে চুমুক দিতে সেই পরিমাণ বিরাগ। এ সব মুখস্থ নিভাননীর, তাকিয়ে থাকেন তিনি সকৌতুক অভিনিবেশে যতক্ষণ না গেলাস খালি হয়। খানিকটা তলানি রেখে গেলাস নামাতে পারলে জয়গর্ব বোধ করতে পারে কনখল, কিন্তু দুষ্টু মা টার জ্বালায় তার কি উপায় আছে? শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করে মার চোখে-চোখ রেখে হেসে ফেলে কনখল। দুধটুকু নিঃশেষ করে গেলাস নামায়।

আমলকী, আর বেলের মোরব্বার দুটি বোয়ম পাশাপাশি রাখা। দেখতে হুবহু এক-রকম, কিন্তু কোনটায় কি আছে জানা আছে ওর। মা যেই বাবার সাথে কথা বলতে সুরু করেন, ঢাকা খুলে একটা বোয়মে হাত ঢুকিয়ে দেয়। মা ওর দিকে তাকান না, শুধু বলেন,—উঁহু, খালি আমলকী নয়, বেলও খেতে হবে একটুকরো। আর হাত ঢুকিয়ে কেন, পাশে চামচে নেই?

চট করে হাত সরিয়ে নিয়ে মার কথামতো মোরব্বা প্লেটে তোলে কনখল। চারটে আমলকী—একটুকরো বেল। মাথা গুঁজে খেয়ে নেয়। তারপর উঠে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়। যাবার সময় মার কানে কানে বলে যায়—দুষ্টু! আর পিঠে ছোট্ট একটি কিল মেরে যায়।

নিভাননী হাসেন।

পড়ার টেবিলে বসে রুটিন দেখে কনখল। বাংলা, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস—ওসব কাল রাতেই তৈরী হয়ে গেছে পড়া। ড্রয়িং আছে। রাতে-আঁকা নিভাননীর বারণ, চোখে বেশী চাপ পড়ে। ম্যাপ, এম্‌নি ড্রয়িং, সকালে করতে হয়। আজকের টাস্ক আছে গাছের ছবি, সার্‌ বলেন অবজেক্ট ড্রয়িং। বইয়ের ছবি দেখে আঁকা চলবে না, চোখের সামনে যে কোনো গাছ দেখবে, আঁকতে হবে। জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে অমূল্যদের বাড়ীর পেছনের ডোবা, তার ধারে একটা নারকেল গাছ আড় হয়ে উঠেছে, অনেক ডাব ধরে আছে তাতে। গাছটা অন্য নারকেল গাছের মতো সোজা দাঁড়িয়ে নেই, যেন পা টান করে দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে ঝাঁক্‌ড়াচুলো একটা লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কথাটা মনে হতে কৌতুক অনুভব করে কনখল। ভাবে, দেবে না কি ঝাঁক্‌ড়া চুলের তলায় একটা মুখ এঁকে ঠোঁটের ফাঁকে জ্বলন্ত চুরুট বসিয়ে—একটু একটু ধোঁয়া উড়ছে? চুরুটের কল্পনায় বাবার কথা মনে এসে যায়, আপন মনে হেসে ওঠে ও। এঁকে ফ্যালে শেষপর্যন্ত শুধু গাছটাই, আঁকবার হাত ভালো ওর। যা দ্যাখে, তাই আঁকে। ইচ্ছে করলে দু এক কাঁদি ডাব বাড়িয়ে দেওয়া যায়—সত্যি হলে অমূল্যর বাবা বিদ্যাভূষণ মশাই কি খুশীই হবেন—নাঃ, দরকার নেই। যে ক'টি আছে ঠিক্‌ সেই ক'টিই আঁকে।

রৌদ্রছায়ার লুকোচুরিতে গাছের এ-জায়গা ও-জায়গা গাঢ় ফিকে দেখায়, সফ্‌ট্‌ পেন্সিলের শীষ্‌ জিভে ঠেকিয়ে গাঢ় জায়গাগুলোয় আর একবার বুলিয়ে দেয়। রবার ব্যবহার ও প্রায়ই করে না—হাতের কাছে থাকে যদিও। মা বলেন, রবার বোলো না, বোলো ইরেজার, কিন্তু স্কুলে সবাই রবার বলে, এমন কি ড্রয়িংসার্‌ পর্যন্ত। ড্রয়িংসার্‌দের বিদ্যার দৌড় বেশী দূর হয় না জেনে নিয়েছে ও—অন্য সার্‌দের মতো অনেক পাশ দেন না তাঁরা। তাই শুধু আঁক্‌তেই শেখান, পড়তে আর শেখান না। বাপ্‌রে,—মা কতো পড়েন। মার মতো অতো জানবেনই বা কি করে ড্রয়িংসার্‌।

কিন্তু, ইরেজার জিনিষটা দেখতে বেশ। লাল কাঠের বুক, দুধারে পেন্সিল আর কালির দাগ ওঠানোর জন্যে রবার লাগানো। ইংরেজিতে লেখাও আছে কোন্‌ দিকে কি, কিন্তু বলে দিতে হয় না—রং দেখেই বোঝা যায়। জিনিষটা ওজনদারও বটে। সেদিন স্কুলে যাবার সময় ধাঁ করে ছুঁড়ে একটা দয়েল পাখীকে ঘায়েল করেছিল আর কি।

ছবি আঁকা শেষ করে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দ্যাখে—নিজের খারাপ লাগে না। এবার মাকে দেখাতে হবে। জানা আছে যে মার মুখ থেকে শুনবে,—খাসা হয়েছে। প্রথম প্রথম এঁকেছে, কমলালেবু, হাঁসের ডিম, বেগুন এইসব। তার পর পেয়ালা, ফুলদান। মা সব-তাতেই বলেছেন 'খাসা হয়েছে'। গাছপালা আজকে সুরু হোলো। কিন্তু আয়োয়ার সর্দারীর শেষ নেই। বেগুন দেখে বলেছে, 'পোকায় খাওয়া নাকি রে?' ডিম দেখে বলেছে, 'হাঁসের না ঘোড়ার?' ফুলদানী দেখে বলেছে, 'ধর্‌ ধর্‌—পড়ে ভাঙ্‌ল বুঝি!' নিজে ত ছাই আঁকতে পারে। তবুও কনখল জানে মার পরই আয়োয়াকে দেখাতে হবে।

কোন্‌ নিকষ আছে এই দুই জহুরীর হাতে ওর গুণাগুণ যাচাই করবার, এসব তথ্য নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো দিব্যজ্ঞান নেই ওর, কিন্তু মন যে ওদেরই ভালো লাগা-না-লাগার কাঙালী, পুঁথিকেতাব না হাঁটকেও এ সত্য ওর মনে দৃঢ়মূল হয়ে আছে।

আর একবার আসল গাছটার সাথে ছবিটা মেলাতে গিয়ে ডোবার ধারে গাছতলায় মায়াদিকে দেখা যায়। মায়াদি জলভরা দুটো বালতি দু'হাতে ধরে' আঁটকাপড়ে খালি মাথায়

ঘাট থেকে বাড়ীর দিকে চলেছে। সূর্যের আলো মুখে পড়ছে, চোখ পিট্‌পিট্‌ করছে মায়াদি—হাত জোড়া, তাই ভুরুর ওপর হাতের তেলো ঢেকে আড়াল করতে পারছে না। কনখল ভাবে, কি বোকা, একটা বালতি ঘাটপাড়ে রেখে বাঁ হাতেরটা বাড়ীতে পেঁছে, ফিরে এসে আর একটা নিয়ে গেলেই ত হয়—চোখ ধাঁধিয়ে আছাড় খাওয়ার ভয় থাকে না। তা' না, দুটোই একসাথে নিতে হবে! মেয়েগুলো আসলে বোকা। বলবে নাকি চেঁচিয়ে মায়াদিকে ডেকে—

হঠাৎ মনে পড়ে যায় সন্ধেয় চিলেকোঠা থেকে ওদের স্নান করা দেখার কথা। আকর্ণ লাল হয়ে ওঠে ওর। কার যেন অনুক্ত নিষেধাজ্ঞা বাজতে থাকে কানে, 'চল্‌বে না, চল্‌বে না—অমন করে মায়াদিদের দিকে তাকানো চল্‌বে না, সহজভাবে তাদের ডেকে কথা বলাও চল্‌বে না।'

এ কী হোলো কনখলের? অকারণে অসহায় বোধ করে নিজেকে, বিবর্ণ হয়ে যায় ওর মুখ। চেয়ারে বসে ড্রয়িংবুকের ছবিটার দিকে ঝাপ্‌সা চোখে তাকিয়ে থাকে, তালগোল পাকিয়ে ছবির পেন্সিলের আঁকগুলো একবার মায়া একবার ঊষার রূপ নেয়, বিকৃত প্রলোভনের রূপ, ভয় লাগে দেখে। দুহাতে মাথা টিপে মুখ নীচু করে বসে থাকে।

পরদা ফাঁক করে দরজার ওপাশ থেকে নিভাননী ডাকেন,—ও কি কংখ্‌—মাথায় হাত দিয়ে বসে যে? শরীর খারাপ লাগছে বুঝি? দেখি, দেখি,—

এগিয়ে আসেন তিনি। একলাফে মার বুকে গিয়ে মুখ লুকোয় কনখল। আধ মিনিট। তারপর সহজ হাসি হেসে বলে,—কিচ্ছু না মা, কেমন যেন ঘুরছিল মাথাটা।

—সে কি রে—জ্বরটর হয়নি ত? কপাল ত গরম ঠেক্‌ছে—কানের পাশের শিরা দপ্‌-দপ্‌ করছে! চল্‌ ত দেখি থার্মোমিটর লাগিয়ে—

টেম্পরেচার ওঠে না—জ্বর নেই। তবু নিভাননী বলেন,—থাক্‌, আজ স্কুলে গিয়ে কাজ নেই। মাথা যখন ঘুরে উঠেছে একবার,—

—না মা, কিচ্ছু হয় নি। ও কখন সেরে গেছে। খুব ভালো আছি আমি। স্কুলে যেতে বারণ কোরো না মা—

—তবে চল্‌। পিঠে বুকে ভালো করে তেল মেখে দিই, ভালো করে নেয়ে নিবি চল্‌—

মা'র ত তেলমাখানো নয়, তেলকুস্তি। ঘষে, রগ্‌ড়ে, চাপড় মেরে সর্বাঙ্গে তেল বসিয়ে, তবে ছাড়বেন মা। আধঘণ্টার ব্যাপার। তা ছাড়া, বড় হয়েছে এখন, মার কাছে উদোম হয়ে তেল মাখতে,—

ধেৎ, লজ্জা করে। বলে না কিছু, কিন্তু ঘন ঘন মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়।

যাচ্ছি নাইতে, আমি নিজেই তেল মাখতে পারি।

—তবে চল্‌, পিঠে শিরদাঁড়ায় আমি ঘষে দিগে। আর শোনো,—কানে, নাকে তেল দেবে।

গম্ভীর হয়ে বলেন নিভাননী। মনে মনে ছেলের লজ্জার কারণ বুঝে হাসেন। "শোনো," "দেবে"—শুনে কনখল বোঝে আজ এই ঝাঁজালো সর্ষের তেল নাক দিয়ে হুস্‌ হুস্‌ করে টেনে নাকের জলে চোখের জলে এক হতেই হবে, উপায় নেই।

এতটা কষ্টসওয়া আর আত্মত্যাগ বিফল হতে দিতে চায় না কনখল। মাকে দিয়ে কড়ার করিয়ে নিতে চায়, পরিবর্তে কিছু পাবার। বলে,—বেশ, অনেক তেল টানব নাক দিয়ে। কিন্তু স্কুল থেকে এসে পার্শেল খুলব আমি। তুমি আগেভাগে খুলে রেখো না।

—'আচ্ছা,' বলে মা হেসে রাজী হন।

পার্শেল মানে গুরুদাসের বইয়ের প্যাকেট। কলকাতা থেকে এসেছে, শুনেছে কনখল চায়ের টেবিলে। দুপুরে ইউসুফ টাকা নিয়ে গিয়ে ভি-পি ছাড় করে আনবে, জানা আছে ওর। আগেও করেছে। কিন্তু মা আগেভাগে কেটেকুটে বই বার করে রাখেন বরাবর। প্যাকেটের সুতো, বাদামী কাগজ, আর বইমোড়া ভেতরকার নানান রকম লেখাওয়ালা কাগজ—এইগুলোর ওপর ওর বইয়ের চাইতে কম লোভ নয়। আর প্রথম প্যাকেট খুলে একত্রে বাঁধা পাঁচসাতখানা বইয়ের গন্ধ শুঁকতেও খুব ভালো লাগে ওর, ভালো লাগে বইয়ের পাতা ওলটানোর আগে মলাটের এপিঠে-ওপিঠে হাত বুলোতে। সোনার জল রুপোর জলে লেখা মলাটে বইয়ের আর লেখকের নামগুলোর দিকে সগর্বে তাকিয়ে থাকতে। ওগুলো না করতে পেলে যেন বই পড়ার আনন্দ অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এই সহজ কথাটা কেন সব্বাই বোঝে না? যে কোন প্রথম নতুন বই কনখলের কাছে সর্বদা লেখকের প্রতিমূর্তির মতো লাগে, সশ্রদ্ধ আগ্রহে উলটে-পালটে দেখে।

তা ছাড়া, এবারে আকর্ষণের বস্তু আছে। ছেলেদের রূপকথা, ছোট গল্প, ভ্রমণকাহিনী, জঙ্গলের গল্প, এ-ধরনের বই অনেক পড়া। এবারে আছে ছেলেদের উপন্যাস—"চারু ও হারু"। সেই "ঠাকুরমার ঝুলি"র লোকটার লেখা। অদ্ভুত লেখা, আর তেমনি আশ্চর্য সব ছবি। ঝুলি বইটার একটা ছবি, আর তার তলার দু লাইন লেখা, ওর মনোহরণ করে রয়েছে আজও। সেই যে, একটা মেয়ে—না না, বনদেবী—তবে দেখ্‌তে ঠিক্ আয়েষার মতো,—নেমে আস্‌ছে পাহাড় থেকে, আর দু পাশ থেকে গাছ লতা পাতা পশু পক্ষী—যারা একদিন পাথর হয়ে গিয়েছিল রাক্ষসীর জাদুতে, সব জেগে উঠে বলছে,—নাও নাও, ফুল নাও, ফল নাও, আমাকে নাও—

ও দেখেছে কোনো মাসিক পত্রের বিজ্ঞাপনে, "চারু ও হারু"তে ছবিও থাকবে ঢের। থাক্‌তেও পারে অমুনি ছবি একটা।

ঔৎসুক্য-অধীর মনকে শান্ত করবার জন্যে দুমাদ্দুম করে কয়েক লাফ ভালুক নাচ নেচে নাইতে যায় কনখল।

স্নান শেষ করে জামাকাপড় পরবার পরে আরেক দফা মায়ের হাতে আত্মসমর্পণ। চুল আঁচড়ানো। হাত দিয়ে মাথা পালিশ করে কপালের চুল চিরুনী ঠেকিয়ে এপাশে-ওপাশে সরিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, তা না, মা করবেন কি, দাঁতবিঁধিয়ে চিরুনী চালাবেন, মাথার মাঝখানে দাগ কেটে তবে চুল দুদিকে দেবেন। ওর কপালের ওপর একটা পাক আছে, সেখানকার চুল চিরুনীতে বশ মানে না। যাবার কড়া ব্রুশ চালিয়ে দেন মা। চুলের ওপর লাগে না, কিন্তু খালি কপালে কাঁটার মতো বেঁধে।

প্রসাধন পর্বের পর খাওয়া। এ বেলা রান্নাঘরের দাওয়ায়, আসনে বসে। তেতো আর সুক্তো বাদ দিলে বাকী যাই রান্না হোক্, খেতে ভালোই লাগে ওর। বাড়ীতেই দই পাতেন নিভাননী। গুড়-কলা দিয়ে চট্‌কে দইমাখা ভাত খুব ভালো লাগে খেতে, কিন্তু রসিয়ে খাওয়ার সময় দেয় না ছেলের দল। বাইরে থেকে ডাক পড়ে,—খাওয়া হোলো রে কনখল? হাতমুখ ধুয়ে ছুট্‌তে হয়। নিভাননী চেঁচান,—ওরে, একটু বসে যা,—ঢের সময় আছে। মার কথা অমান্য করা ওর ধাতে নেই। বসে গিয়ে পড়ার ঘরে; ঐ বই গুছিয়ে নিতে যতটুকু সময় লাগে। তার পর মার কাছে এসে, একমুখ হেসে, বলে,—যাই মা?

—আয়। বলেন নিভাননী। গনিমিঞার বাড়ীর বাঁকে যতক্ষণ না ছেলেরা মোড় ঘোরে, তাকিয়ে দেখেন। তারপর যান প্রথমেই কনখলের ঘর গোছগাছ করতে। যা হুটহাসে

ছেলেটা,—ঐ দেখ, ইরেজারটা ভুলে ফেলে গেছে। দিয়ে দেবেন হারুণের সাথে, যখন টিফিন নিয়ে যাবে। রুটিন উল্‌টে দেখেন, হ্যাঁ, টিফিনের পরে ড্রয়িং ক্লাস।

কাজীর বাজারের আগুন নিভেছে, তবে বাজার নতুন করে জে'কে ওঠেনি এখনো। ঝগড়ুর খাজার দোকান খুলেছে, খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে শুক্‌নো মুখে বেচাকেনা করছে সে। পাশ দিয়ে যেতে অমৃত'র সাথে চোখোচোখি হয় কনখলের। অমৃত একরকম গায়ের জোরেই হাত ধরে ওকে টেনে নিয়ে যায় খানিকটা। টাউন ক্লাব পড়ে রাস্তায়। অমৃত আড়চোখে তাকায় কনখলের দিকে। হু। যা ভয় করেছিল তাই। জল ভরে' টস্ টস্ করছে কনখলের চোখ। ভোলাতে চায়। বলে,—জানিস্, এই টাউন ক্লাবে একটা খুব ভালো লাইব্রেরী আছে। কত রকমের বই—বড় বড় আলমারী ভরা। আর কত ছবির কাগজ আসে, সব মস্ত একটা টেবিলে পাতা থাকে, সরু শিক্‌লি দিয়ে টেবিলের সাথে আঁটা। ওগুলো যত ইচ্ছে দেখো, আর পড়ো, কিন্তু তুলে নিয়ে যাবার জো নেই।

—আর আলমারীর বই? সেগুলো?

—সেগুলো নেওয়া যায় মেম্বর হলে। ছোট্‌কা ত' আমাদের বাড়ীতে দু'খানা করে বই নেন একেকবারে। মা, দিদি, কাকীমা সবাই পড়ে।

কনখল কুতূহলী হয়ে ওঠে। বইয়ের প্রসঙ্গে রুক্‌মানিয়ার স্মৃতি চাপা পড়ে। উৎসাহে বলে,—আর তুই? তুই পড়িস্ না?

—ধুত্তোর বই! আমি ইস্কুলের বই-ই ছুঁতে ভালোবাসি না, তার আবার লাইব্রেরীর বই। আর পড়ব কখন বল্—এই ত' ইস্কুল আর খেলা, তারপর একটু ডনবৈঠক, আর সোসাইটিতে সন্ধের পর শোলোক শোনা। গীতা বলে একটা সংস্কৃত বই আছে জানিস্, —খালি ভীষণ সংস্কৃত নয়, খুব কঠিনও। তাতে পশ্যামি দেবাং স্তবদেবদেহে বলে' ছড়া আছে। সেইটে স্বামীজি বই থেকে পড়েন—আর প্রকাশদা, কিম্বা আর কেউ বাংলায় মানে করে বলে।

—মানে করে দিলে আবার কঠিন থাকল কোথায়?

—সে তুই বুঝবি নে। গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদি কর্ত্রে শুনলে হাসি পায় আমার—আবার মানে শুনলে ভয় হয়। কেষ্টঠাকুর অর্জুনকে মুখ হাঁ করে ভয় দেখাচ্ছে, তারই গল্প। হাঁ-মুখের ভেতর নাকি তুলকালাম কাণ্ড চলেছে—লোক জন্মাচ্ছে, খুন হয়ে যাচ্ছে, এই সব। যতো সব আজগুবি ব্যাপার—

—তবে যাস্ কেন? না গেলেই ত হয়।

—সে হয় না, আমাদের যেতেই হয়। এই ত' বছর কয়েক আগে, বাবা, কাকা—বাড়ীর সবাই হাতে হলুদে সুতো বেঁধে বলল, আজ রাখীবন্ধন। বাড়ীতে নো রান্না। বলল, 'ভাই-ভাই, এক ঠাঁই'। মন্ত্র নিল 'বন্দে মাতরম'। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর একটা দিনে সবাই রাখী বাঁধে। সোসাইটির মন্ত্রও 'বন্দে মাতরম্' কিনা, তাই আমাদের যেতে হয়।

গীতা সোসাইটির তথ্যপূর্ণ বর্ণনায় আকৃষ্ট হয় না কনখলের মন। শুধু কেষ্টঠাকুরের হাঁ-মুখের গল্পটা ভালো লাগে ওর। শুনতে হবে মার কাছ থেকে। অমৃতটা বলে আজগুবী! আরে, কত অদ্ভুত কাণ্ড রোজ হচ্ছে, আর এই হোলো আজগুবী? অমৃতটা পড়াশুনা করে না কিনা, তাই কিচ্ছু জানে না। পড়ত কঙ্কাবতী আর ঠাকুমার ঝুলি, হ্যাঁ, তবে টের পেত, কত কি যে হয় যা চোখ দিয়ে সব সময় দেখাই যায় না, বোকার মতো বোঝাও যায় না।

ইস্কুলে ওর নারকোল গাছের ছবি তারিফ পায়—ইংরেজিতে এক্‌সেলেণ্ট লিখে দেন

ড্রয়িংসার্। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে ভোলেন না,—নিজে এ'কেছ ত'?

—হ্যাঁ সার্।

—বেশ, বেশ। ছেলেরা, সব দেখে রাখ। ইক্‌বাল, তুমি যে ফণী মনসার গাছ এ'কেছ, ওটা উইয়ের ঢিবি, না গাছ, বোঝা যাচ্ছে না। আর সনাতন, তোমার কলাগাছে গাছের থেকে কলাই বেশী। অত ফল হলে গাছ খাড়া থাকে কি করে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি—বলতে হবে না। তুমি কলা খেতে খুব ভালোবাসো। আর বাসে কারা? জানো ত? বাঁদর। অতএব তুমি একটি—

চাপা হাসির খুস্‌খাস্ ওঠে। সনাতন অপ্রতিভ হয়ে আমতা আমতা করে। মাতব্বর বলে একটি বয়স্ক ছেলে সুরমা নদীর ওপার থেকে নৌকো করে রোজ স্কুলে আসে। চাষী-গেরস্তের ছেলে, অবস্থাপন্নও বটে। গোঁফদাড়ি উঠে গেছে। দাঁতের রং দেখে বোঝা যায় নিয়মিত পান খাওয়ার অভ্যেস আছে—যদিও ক্লাসে খায় না। তার দিকে তাকিয়ে সার্ বলেন, —মাতব্বর মিঞা, তোমার আমগাছে বাংলা পাঁচের মতো আম ত ঢের ফলিয়েছ, কিন্তু আম-পাতাগুলো সব পান হয়ে গেল কেন? ফল ত নিজেরাই খাব, পাতাগুলো কেন আর গরুতে খায়, তাই না? কি করবে বাবা, ভগবানের নিয়ম,—আম ফলাতে গেলে সে গাছে পানের বরজ বসানো চলবে না, খোদার ওপর খোদকারী না হয় নাই করলে।

মাতব্বর একটু হাবাগোবা ঠাণ্ডা মেজাজের লোক। ঘাড় নেড়ে মেনে নেয় সারের কথা।

ড্রয়িংসার্ বোর্ডে একটা আনারস আঁকেন—বোঁটার কাছে একগোছা পাতাসুদ্ধ। বলেন, —আঁকো সবাই। বারো মিনিট সময়। জলঢুবীর আনারস, ভারী মিষ্টি—চট্‌পট এ'কে ফেলো।

আঁকতে মনোনিবেশ করে ছেলেরা। মাস্টারমশাই আস্কে পিঠের মতো ইয়া বড় জেবঘড়ি বার করে সময় দেখেন। পাঁচ মিনিটে ছবি শেষ করে পেন্সিলের শীষ্ জিভে ঠেকিয়ে আনারসের গাঁটে গাঁটে চোখ আঁকে কনখল। হয়ে যায় বারো মিনিটের আগেই।

—টাইম্ আপ্, বলেন সার্। সনাতনের খাতা দেখে আবার মন্তব্য করেন,—আরে, এ যে ড্রিলমাস্টার মশায়ের চেহারা এ'কে ফেলেছো সনাতন! পাতার জায়গায় একটা চাদর দু ভাঁজ করে এ'কে দিলেই হয়।

ড্রিলমাস্টার নগেনবাবুর রিলিফ ম্যাপের মত মুখভরা আঁচিল—তাঁর সাথে ড্রয়িংসারের দা-কুমড়ো সম্পর্ক। আর সবাই হাসলেও এ মন্তব্যে সুখী হয় না কনখল। কোথায় যেন রুচিতে বাধে। তিনিও ত সার্! আর ড্রিল করান কি ফার্ষ্টক্লাস। 'লেফ্‌ট রাইট, অ্যাবাউট ঠার্ন'—বলেন, যেন পুলিশদের কুচকাওয়াজের মতো।

সামনের দিনের ড্রয়িংয়ের টাস্ক বলে দেন ড্রয়িংসার্। হাঁস, কি মোরগ। যার যা খুশী। তবে আসল পাখী দেখে—ছবি থেকে নকল করে নয়। ছুটি পায় ছেলেরা।

উঁচু ক্লাসের ছুটি হওয়া পর্যন্ত সামনের মাঠে খেলে ছেলেরা। খেলার মাঠের ওধারের পুকুরে—পুকুর নয়, দীঘিই বলা চলে, পানিফলের জঙ্গল হয়ে আছে। পেরিয়ে পদ্মবন। খুব ফুল ফুটেছে, কিন্তু আনা শক্ত, সিঙ্গাড়ার কাঁটাজাল ভেদ করে যাবে কে? পানিফলকে সিঙ্গাড়াও বলে, জেনেছে কনখল।

ছেলেরা পার্টি করে কাবাডি খেলায় মাতে। কনখলের মন নেই খেলায়। প্রকাশ বারণ করে দিয়েছে হাসপাতালে যেতে—বিকেলটা ফাঁকা লাগে। বাড়ী ফিরে আবার খেলা—কিন্তু মন টানে না ওর। জিমন্যাসিয়ামের প্যারালেল বারে অমৃতের কাছে শেখা দু-একটা কস্‌রৎ

করে—প্রাথমিকগুলো—শক্তগুলো পেরে ওঠে না।

সকালটা মেলে ধরে সম্ভাবনার অনন্ত জগৎ। বিকেলের পড়ন্ত রোদ যেন সমাপ্তির আঁচল বিছিয়ে চলে। বিছোনো শেষ হলে আর এক রাজ্যের দরজা খুলে যাবে, সেখানে দিনের এসব সাথীদের মধ্যে কেউ থাকবে না। থাকবে যারা, তারা দিনের হৈ-হল্লায় হুল্লোড় করে আসে না। আত্মগোপন করে অগোচরে সারাদিনমান শুধু প্রহর গোনে রাতের রাজ্যে আত্ম-প্রকাশ করবার প্রতীক্ষায়।

ইস্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজতে ছেলেরা পাড়াওয়ারী দল বাঁধে। যারা যে পাড়ার, সেই সেই পথ ধরে। অমৃত বলে,—বাজার দিয়ে যাব না, চল হাসপাতালের সামনে দিয়ে যাই। ঢুকব না, প্রকাশদার বারণ। খালি দেখতে দেখতে যাব।

কনখল এক কথায় রাজী। বলে,—চল্, চল্।

অমৃতের মনের কথা কনখল জানে না, জানতে চায়ও না। রোজকার ফেরবার চেনা সড়ক ছেড়ে আজ হাসপাতালের রাস্তায় বাড়ী ফেরার কথায় উল্লসিত হয় ওর মন, ওই প্রকাশদা যে ঘরে থাকে সেইটে একটু দেখতে পাওয়া যাবে, এইটেই যেন মস্ত লাভ, এই মনে করে'। হৃষ্টচিত্তে অমৃত'র সাথ ধরে।

সেই সেদিন পুলিশ দেখে যে গলির মোড়ে ওরা বাঁক নিয়েছিল, সেই দিক থেকে বেরোয় দুজন লোক। অমৃত বলে,—ওইটে বেণী টিক্‌টিকি, সঙ্গের ওটাও পুলিশ—সাদা পোষাকে।

—টিক্‌টিকি কেন বলছিস্, বেশ ত জাঁদ্‌রেল গুঁপো চেহারা।

—আরে টিক্‌টিকি মানে সি আই ডি। স্বদেশী পুলিশ আর কি। ওরা বিলিতি নুন কাপড় পোড়ালে আর বন্দেমাতরম বললেই ধরে জেলে দেয়। বেণীটা ওদের দারোগা—ভারী শয়তান।

মা বলেছেন, ডাকাতি করতে যাবার সময় 'জয় মা কালী' বললে দোষ, আর দল বেঁধে দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় 'বন্দেমাতরম' বললে। এখন ত দুজনে একা একা যাচ্ছে—এখন দোষের কি আছে?

লোক দুজন ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না—সোজা হাসপাতালের দিকে এগোয়। গলির মোড় ঘুরে, যখন চোখের আড়াল হয়েছে, কনখল জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—'বন্দে মাতরম'।

অমৃত হকচকিয়ে ওঠে, বলে,—করছিস্ কি রে—দৌড়ো, দৌড়ো—পালা, পালা,—

সানুচর বেণী দারোগা ফিরে এসে খোঁজ করে। কাউকে দেখতে পায় না। টাউনের ডেঁপো ছেলেরা ওই ধ্বনি তুলে ওকে যখন-তখন খেপায়। কিন্তু এ ছেলেদুটো কে, নজর করে দেখাও হয়নি। এক লহমা যা চোখে পড়েছে, ডানপিটে বদ্‌মাস নয় বলেই মনে হয়েছে।

সঙ্গের ছোপধরা-দাঁত ট্যারা কনষ্টেবলটা বলে,—পোলাগুলিন কর্তার ল্যাজ মলে, আর কি!

ল্যাজে মোচড় খাওয়া বলদের মতোই ভুঁড়ি দুলিয়ে লাফায় বেণী দারোগা। ঢাকাই সিপাই বাঙ্গালসুলভ সরস কৌতুকে টিপ্পনি কাটে,—ঘুঙ্গুর বান্‌ধলেই লুংফা তয়ফা-ওয়ালী! থামেন, কর্তা, থামেন! বিনা টিকিটে দেইখা ফালাইবো মাইন্‌ষে!

থাম্ ব্যাটা বঙ্গচন্দ্র! এ তোর প্রকাশের চেলা না হয়ে যায় না, বুঝলি? আচ্ছা, পালের গোদা ত কুপোকাৎ। সময় আসুক, শোধবোধ হবে'খন।

পদ্মাপার বিহারী বলে,—একখান জবর দামী কথা কইছেন কর্তা! হময় আহুক, কাঠল পাকুক—অহন কিলাইয়া লাভ কি!

ফিরে, হাসপাতালে গিয়ে ঢোকে ওরা।

বাড়ী গিয়েই কনখল বইখাতা ছুঁড়ে ফেলে নিভাননীকে খুঁজে বার করে। জড়িয়ে ধরে' 'বন্দে মাতরম্' বলার গল্পটা রুদ্ধনিশ্বাসে করে তাঁর কাছে। নিভাননী কৌতুকবোধ করেন না, বকেনও না। একটু চিন্তার রেখা পড়ে চোখের কোণে। তারপর সহজ সুরে বলেন,—অমন বলতে নেই। পুজোর মন্ত্র কি যেখানে-সেখানে যাকে-তাকে বলতে আছে রে।

অপ্রতিভ বোধ করে কনখল। মার মুখে পুজোর উল্লেখে সম্ভ্রমের সুর ফোটে। পুজো বলতে ও যতটুকু বোঝে, সে ত অবিমিশ্র উল্লাস ও আনন্দ! নিভাননীর মুখের দিকে তাকায়, সেখানে ঈষৎ হাসি ফুটেছে তখন। নম্র গলায় বলে,—আর বলব না মা।

তার পরই অন্য কথা মনে পড়ে যায়। চঞ্চলচরণে নাচতে থাকে।

—পার্শেল? বইয়ের পার্শেল? খোলো নি ত' মা? দাঁড়াও, দো-ফলা ছুরিটা আনি—

ছুট্ দেয় ছুরি আনতে। নিভাননী যান ভি-পি'র প্যাকেট বার করতে।

ছেলের হাতে বইয়ের প্যাকেট দিয়ে ভেতরবাড়ী যান নিভাননী। চুলবাঁধুনির দল আসতে সুরু করবে এখুনি। তার আগে ছেলেকে খেতে দিতে হবে। রহমৎই দেয়—তবে তিনি থাকেন সামনে। বলতে বলতে যান,—সুত্‌লী কেটেই এসে খেয়ে নিবি কখ্‌খ্‌। বই বার করবি পরে।

খাওয়া, এবং বই বা'র করা, দুটোর প্রলোভনই জোরদার। ভেবেচিন্তে প্যাকেট বগলে কনখল বলে,—তবে আগে খেয়েই নি মা, চলো, দেবে চলো।

খাওয়া সেরে পার্শেল হাতে খোলা বারান্দার এক টেরে এসে বসে। ব্যাঙা গুটি গুটি এসে পাশে দাঁড়ায়। অনেক ডাকটিকিট মারা এই বিচিত্র পুলিন্দার উন্মোচন অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ছুরি দিয়ে কুট্ কুট্ করে সুতো কাটে কনখল। বাদামী কাগজের ভাঁজ খোলবার সময় আর তর্ সয় না ব্যাঙার। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে,—ভেতরে কি রে?

—বই।

নিজের গলার সুরে নিজেই চমকে ওঠে কনখল। পুজোর কথা বলতে গিয়ে মার গলায়ও এমনি সুর বেজেছিল, মনে পড়ে ওর। একমুহূর্ত হাত থেমে যায়, তার পর সন্তর্পণে বইয়ের মোড়ক খুলে একখানার পর একখানা বই বা'র করে কোলে রাখে।

প্রত্যাশিত "চারু ও হারু" এসেছে। আর সব নতুন বইয়ের মধ্যেও এ যেন নতুনতম, চট্ করে ওটাকে নিজের কোলেই আরেক দিকে সরিয়ে রাখে। তরতাজা নতুন বইগুলোর স্পর্শ কি সুখের, গন্ধ কি মনভোলানো,—নেড়ে, শুঁকে, বুকের কাছে নিয়েও সাধ মেটে না ওর। মিলনমন্দির, গোরা, পোষ্যপুত্র। এসব মায়ের বই। কৌতুককাহিনী, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, এগুলো ওর। সবচেয়ে তলায় একখানা বইয়ের ক্যাটালগ। ভারী মজার পড়তে। কত লোক, কত সব বই লিখেছে, তার ফিরিস্তি। মুখস্থ হয়ে যাবে দুদিনে। কার লেখা কোন্ বই ঠিক বলে দিতে পারবে ও। সেদিন নতুনমাসী উষার খাটের ওপর একটা বই দেখেছিল, "মডেল ভগিনী"। কে লিখেছে জানে না ও, বইটাও পড়া নয়। দেখতে হবে ক্যাটালগে নাম আছে কি না। তবে জাল মোহান্ত আর জালিয়াৎ ক্লাইভ একজনের লেখা নয়, আর কোন্‌টা কার লেখা ঠিক জানা আছে। শেষের বইটা মা আবার গয়নার বাক্সের তলায় রাখেন, কাউকে পড়তে দেন না। বড়দেরও না। ছাপা বই, কেন লুকিয়ে রাখতে হয়, বোঝে না ও। মা যেন জানতেও দিতে চান না ও বই বাড়ীতে আছে।

বাণ্ডিল ধরে বই নিয়ে মার হাতে আগে দিতে হবে। মা ওর বইগুলোতে উপহারের

পৃষ্ঠায় লিখে দেবেন—'কংখ্, প্রাণাধিকেষু।' তলায় লিখবেন,—'মা জননী'। তারপর ও ইচ্ছে-মত বইয়ের যেখানে-সেখানে লিখবে—'শ্রীকনখল বাগ্‌চী,' আর তাক্ মতো জায়গামাফিক জলছবি সাঁটবে। এম্‌নিই হয়ে আসছে বরাবর।

বইয়ের জল্পনায় ব্যাঙার কথা ভুলেই গিয়েছিল। ব্যাঙা ওর ঘোড়ায় চড়ার এলেম দেখেই সমীহ করতে শুরু করেছিল। এখন বইয়ের রাশে তন্ময় হয়ে যাওয়া দেখে ওকে যেন অন্য জগতের জীব বলে ভাবতে আরম্ভ করেছে। ব্যাঙার মুখে কথা ফোটে,—এই সব বই তুই পড়বি নাকি রে?

—পড়বই ত। সব পড়ব। তবে এই তিনটে আমার একেবারে নিজের। বাকী মা'র। তোকে ত আমার সব বই দেখাই-ই নি। ঢের বই আছে আমার। দেখাব একদিন। আর দ্যাখ্,—

বলতে গিয়ে থেমে যায়। মনে পড়ে যায় মাকে বলে ব্যাঙাকে স্কুলে ভর্তি করার কথা। পড়তে শিখলে ওর সাথে কত বইয়ের গল্প মজা করে করা যাবে।

বইয়ের মোট বগলদাবা করে উঠ্‌তে উঠ্‌তে বলে,—স্কুলে পড়বি ব্যাঙা?

ব্যাঙা নির্বিবাদে ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, পড়বে। কনখলের সাথে পাংক্তেয় হবার পথে একধাপ এগিয়ে যাবার সম্ভাবনায় অজানিতেই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে মন। ঢোক চিপে বলে,—তুই শিখিয়ে দিস্ পড়তে আর লিখতে। তা না হলে ইস্কুলে নেবে কেন? তবে কিন্তু—কি মনে করে বিষণ্ণ হয়ে যায় ব্যাঙা। স্কুলে ভর্তি হবার উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। আম্‌তা-আম্‌তা করে বলে,—আজ বাবা আসবে রে—ছাড়া পাবে আজকে। যদি না দেয় ইস্কুলে যেতে—

—কি বল্‌লি? দেবে না? আলবৎ দেবে। মা বললে না দিয়ে পারে কখনো? আরে, বাবা আসবে তোর—সে ত খুব মজা হবে। আমার খুব ইচ্ছে করে দেখতে। দু ঘণ্টা ধরে ডুবসাঁতার দিতে পারে—অ্যাঁ, সে ত মস্ত বীর রে! চল্ চল্, মাকে বই দিয়ে আসি, আর খবরটাও দিই গে।

ব্যাঙা দেমনা ভাবে কাপড়ের খুঁট বুড়ো আঙুলে জড়াতে খুলতে থাকে। কিন্তু পাছু ধরে কনখলের।

একদমে নতুন বই, ব্যাঙার স্কুলে ভর্তি হওয়া, ব্যাঙার বাবার জেলখালাস হয়ে বাড়ী ফেরা, সে যে কাজ পেলে আর কারুর বাড়ী থেকে না বলে খাবার জিনিষ নেবার মতো অপরাধ করবে না,—অতএব তাকে আসামাত্র কাজ দিতেই হবে,—ফিরিস্তি শুনে নিভাননী ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বলেন,—হবে, হবে, শুনব, শুনব। বই রাখ্, এখন খেল্‌গে যা, পরে ধীরে-সুস্থে ব্যবস্থা হবে। বাবারে বাবা, ছেলে নয়ত বর্গী! হারে রে রে করে এসে পড়ল একেবারে!

ছেলের আবদার আর আকুতির ঐকান্তিকতায় স্নেহসজল হয় নিভাননীর মন। জগদ্ধাত্রীর মতো হাসেন কনখলের মাথায় হাত রেখে। বলেন,—খেলাধুলোর পর আসিস্ তোরা দুটিতে, ঠাণ্ডা হয়ে শুনব সব কথা। এখন দেখ্‌ছিস্ না ভোর মায়াদি, নতুন মাসি, সবাই চুল বাঁধতে এসেছে? আর এ'কে প্রণাম কর্,—ইনি তোর প্রকাশদার মা।

পাতলা চেপা ঠোঁট, খাঁড়ার মতো নাক, জুল্‌জুলে চোখ, কদমছাঁটা চুল—সুগৌর গায়ের রং। এই বর্ষীয়সী বিধবা মহিলার দিকে তাকিয়ে যতটা শ্রদ্ধাবনত হওয়া উচিত ছিল ততটা হোলো না কনখলের মন। প্রণাম করল। কিসের যেন অভাব আছে ঐ সুন্দর মহিলার চেহারায়—ধরতে পারে না ও। শুধু বোঝে, ওর মা'য়ের মুখে যে স্নেহ ঢলঢল সুষমা আছে, এঁর তা নেই। চোখের দৃষ্টি যেন তীব্র আগুনের শিখা, ঝল্‌সে, পুড়িয়ে দেয় বুক পর্যন্ত। মাকে বলে,—তাই হবে মা। খেলার পরে সব শুনো। যা বলেছি সব করে দিতে হবে, হবে,

—হবে। এই বলে যাচ্ছি।

ব্যাঙার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে রওনা দেয়।

ঊষা ভঙ্গী করে মুখ ভেঙায়, মায়া ঊষার পিঠে মুখ গুঁজে হাসি চাপে। দেখেও দেখে না কনখল। যেন গা-সওয়া হয়ে গেছে ঊষার নির্লজ্জ বেহায়াপনা। অথচ, গুরুজন সম্পর্ক। গুরুজন! মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে কনখল। ধুম্‌সি, মুট্‌কি কোথাকার। আচ্ছা, দিন আসুক, দেখা যাবে।

১৩

সে রাত্তিরে আকাশ-ভরা মেঘবাহিনীর কুচকাওয়াজে চাঁদ নাস্তানাবুদ হয়ে উঠেছে। ভরা শরতের একাদশী কি দ্বাদশীর রাত। প্যাঁজা তুলোর মতো ফাঁপা, গাঢ় ফিকে সাদা মেঘের অবিরল হাম্‌লা চলেছে হিমক্ষরা আকাশের বুকে, চাঁদ আমলেই আনছে না। মেতেছে লুকোচুরি খেলায়। ক্ষণেকের মুখলুকানো কাটিয়ে উঠছে পরক্ষণে হাসিমুখে উঁকি দিয়ে।

আধখোলা জানালা দিয়ে দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছে কনখল। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়েছে একদৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়ে—ছুট্‌ছে কারা? মেঘেরা? না চাঁদ? থেমে নেই কেউ, মনে দয়েছে ওর। চলা, চলা, চলা। সঞ্চরণের অবিরাম রোমাঞ্চ আচ্ছন্ন করে ফেলেছে চেতনাকে, সচল সুস্থির বুকে ঢলে পড়েছে একসময়—ঘুম যেন পরম সুখকর তরল ধারা, গা ঢেলে দিয়েছে তাতে।

* * *

—আয়েষা, তুই? ভাব্‌ছিস খুব চম্‌কে দিয়েছিস্‌? ওই কামিনী গাছের তলা দিয়ে, ভিজে দুর্বোর ডগায় ডগায় টিপে টিপে পা ফেলে, চুপিসারে এসে হক্‌চকিয়ে দিবি ভেবেছিলি বুঝি? আলো-আঁধারিতে কতো আগেই তোকে দেখে ফেলেছি, টেরও পাস্‌ নি। ও কি পরেছিস্‌ রে! হাঁটুর ওপর ঘাগ্‌রা—খালি পা—হাতকাটা জামা—শীত লাগে না তোর? আমার ভাই গা শির্‌শির্‌ করছে। পা দুটো কি জমানো মাখন দিয়ে তৈরী না কি রে তোর? পা ফেল্‌ছিস্‌, শব্দ হচ্ছে না একটুও। হাত দুটো কি হাতীর দাঁতের? কি ধবধবে লাগ্‌ছে! দেখি, দেখি, ঠাণ্ডায় গালে ফাট্‌ ধরেছে—টুক্‌টুকে লাল হয়ে উঠেছে। ঠোঁট দুটোয় পাকা তেলাকুচোর রং ধরেছে। একমাথা ফুর্‌ফুরে সোনালী চুল পেলি কোথা? মিশন ইস্কুলে অম্‌নি করে ছুপিয়ে দেয় বুঝি?

জানলায় দাঁড়িয়ে কেন রে? ভেতরে আস্‌বি না? আমি আস্‌ব? আস্‌ছি দাঁড়া। গোসলখানার দরজা খুলে আস্‌ছি। চল্‌, কোথায় যাবি। অত জোরে হাত ঝাঁকাস্‌ নে। লাফাচ্ছিস্‌ কেন? উঃ, তোর হাত কি ঠাণ্ডারে।

'থেকে থেকে অমন বুকফাটা নিঃশ্বাস কে ফেল্‌ছে রে? একটানা গুম্‌রে কাঁদছে যেন। কিছু না,—ঝাউয়ের শন্‌ শন্‌? হোক্‌ গে—আমার ভালো লাগছে না। তুই হাত ছাড়িস্‌ নে। তোর হাতে হাত ধরা থাক্‌লে সব ভালো লাগে আমার। আর কিচ্ছু চাই নে। তুই,—তুই—তোকে ছাড়া আর কিচ্ছু চাই নে।

আগুনচোখো একটা ডাইনি আস্‌ছে দেখ্‌। চুলগুলো সাপের কুণ্ডলী, হাঁ মুখটা

লাকাতুরার হাওরের মতো—আলেয়ার মতো জ্বলে জ্বলে উঠ্‌ছে দাঁত কপাটি—বুক যেন শাহজলালের দরগার বড়ো গম্বুজ দুটো—আমাকে পিষে মারতে আস্‌ছে—আয়েষা, আয়েষা—বাঁচা, বাঁচা—

গেছে। কি করে তাড়ালি রে? খালি একটু হেসে? অমন করে সাপ্‌টে ধরেছিস্‌ কেন বুকের মধ্যে আমাকে? দেখ, কেমন ঘেমে নেয়ে উঠেছি। তবু ভালো লাগছে। আমাকে ছাড়িস্‌ নে আয়েষা। ঐ, ঐ—দেখ্‌—আরেকটা, আরেকটা—,শাঁকচুন্নী—কি মিষ্টি হাসি—দু হাত জোড়া। কিসের ভারে—পাচ্ছে না নিতে,—টস্‌ টস্‌ করে ঘাম ঝরছে কপাল থেকে—বিড়ে বাঁধা চুল—দেখ্‌তে সুন্দর, তবু ওটা পেত্নী! তোকে দেখেই ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল রে আয়েষা! তোকে দেখে ওরা ভয় পায়, আমি ত পাই নে।

ওই ছোট্ট মেয়ে দুটো কে রে? তুই চিনিস্‌ নে? ওরা ভালো—দেখ্‌ তো কেমন খেল্‌ছে দুটিতে। ওদের গা থেকে নীল আভা বেরোচ্ছে—ঠিক্‌ যেন জোনাকী। আয় একটু বসি। তুই বোস্‌ ঐ খানটায়, ঐ পাথর বাঁধানো ঢিবিতে, আমি তোর কোলে মাথা রেখে শুই। এখানে এত মোমবাতি কে জ্বেলে রেখে গেল রে? একটা, দুটো—তিনটে—না, হ্যাঁ, তাই তো, তিনটে ঢিবিতে তিনটে। আঃ, কি আরাম রে।

মাছ ধরবি? চল্‌ যাই। মা যদি বকেন? তুই সাথে থাক্‌লে বক্‌বেন না, নারে? মা তোকে ভীষণ ভালোবাসেন। আমার মতো। আরে, ঐ পুঁচ্‌কে মেয়ে দুটোও যাচ্ছে রে! যাগ্‌গে। ওদের আর আমাদের মতো মাছ ধরতে হয় না! গামছা টান টান করে ধরে দুদিকে দুজনা ধরব, তারপর একটু ঢিলে দিয়ে—হুস্‌।

কি মজারে। আমার হাঁটু অব্‌ধি—তোর ত পায়ের পাতা ডুবেছে খালি। ওকি রে—আর যাস্‌ নে—কোমর ডুব্‌ল, বুক ডুব্‌ল, আয়েষা,—আয়েষা—ধর্‌ ধর্‌ এই গামছার কোণাটা ধর্‌—আমি শক্ত করে ধরে আছি। আস্তে আস্তে উঠে আয়—যা ভয় পাইয়ে দিস্‌ তুই। ও, তুই ত জলের পোকা—সাঁতার জানিস্‌। আমাকে শিখিয়ে দিবি বলেছিলি? দিয়েছিস্‌? ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম। তোকে দেখ্‌লে আর সব ভুলে যাই ভাই।

দেখ্‌, দেখ্‌, মেয়ে দুটো কি বোকা! জলে নেমেছে। এগিয়ে যাচ্ছে দেখ, যেন ডাঙায় হাঁট্‌ছে। ওরে, যাস্‌নে, যাস্‌নে —ডুববি যে, গেল, গেল—ডুব্‌ল ঐ। দাঁড়া তুই আয়েষা, আমি তুলে আনছি ও দুটোকে। আরে, তুই-ই ত বললি আমি সাঁতার শিখে গেছি, তবে আর ভয় কি রে। এক ডুব সাঁতারে চুলের মুঠি পাকড়ে নিয়ে আস্‌ছি ওদের। তুই আমার কপালে হাত বুলিয়ে দে, এই দ্যাখ, দুশো হাতীর জোর এসে গেছে আমার গায়ে। দিলুম তোর নাম করে ঝাঁপ—আয়েষা—আয়েষা—'

* * * * *

পুকুরের ওপারের অন্ধকার ঝোপ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে একটা লোক—মুখভরা দাড়ি, উস্ক খুস্ক চুল। সাঁই জোয়ান।

—হেই খোকা বাবা—ওকি, ওকি, জলে ডুব্‌বে যে, থামো, থামো—এই দ্যাখো—ডুব্‌ল,—

পেটকোমরে কাপড় বেঁধে জলে ঝাঁপ দেয় লোকটা, ঝপাং। বেশী দূর যায়নি কনখল—দু এক ঢোক ছাড়া বেশী জলও পেটে ঢোকে নি। পায়ের তলায় ঘাড়ের নীচে দুহাত দিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলে আনে। ব্যাঙা, ব্যাঙার মা এসে দাঁড়িয়েছে পুকুর পারে। 'খোকা বাবা,

জলে ডুববে—শব্দ বোধহয় কাণে গিয়েছিল, পাগলের মতো ছুটে আসেন নিভাননী। কনাকে বুকে জড়িয়ে বসে পড়েন বাঁধা ঘাটে। নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখেন নিঃশ্বাস পড়ছে। বুক ঠেলে কান্না উঠ্‌লেও ফেটে পড়েন না।

ব্যাঙার বাবা জোর করে ছিনিয়ে নেয় কনাকে নিভাননীর কোল থেকে। ওর দু' পা ধরে সাঁই সাঁই করে ঘোরায় চক্কর দিয়ে। যেটুকু জল পেটে ছিল, বেরিয়ে যায় নাক মুখ দিয়ে। বিধ্বস্ত কনখলকে আর একবার শুইয়ে দেয় নিভাননীর কোলে। বলে,—আর ভয় নেই মা। দুধ গরম করে একটু খাইয়ে দিন, হাতে পায়ে গরম সেঁক—আর লেপ কম্বল চাপা দিয়ে শুইয়ে দিন এবারে। ভোর ত হয়ে এল,—দিনের আলো হলে ডাক্তার ডেকে পাঠাবেন।

ব্যাঙার বাবার চীৎকারে এ বাড়ীতে ঘুম ভেঙেছিল সব প্রথম নিভাননীর। এখন সবাই উঠে গেছে। পাশের বাড়ীর ঊষা জীবনও এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারীবাবু বুড়ো মানুষ, ঘুমের ওষুধ খান, তাঁর ঘুম ভাঙেনি। হৃষীকেশ, রহমৎ, হারুণ, ব্যাঙা, ব্যাঙার মা, হুমড়ী খেয়ে পড়েছে। রহমৎ ভিড় ঠেলে বলে,—তফাৎ, তফাৎ। বলে' পাঁজাকোলা করে তুলে নেয় কনা বাবাকে।

নিভাননীকে হাত ধরে তোলেন হৃষীকেশ। থরথর করে কাঁপছেন নিভাননী। হৃষীকেশের বলিষ্ঠ বুকের সান্নিধ্য পেতেই উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। হৃষীকেশ কোমরে হাত জড়িয়ে খাড়া করে রাখেন তাঁকে, মাথার চুলে আঙুল বুলিয়ে বলেন,—ভয় কি —ভালো হয়ে উঠ্‌বে! চলো, ঘরে চলো।

ব্যাঙার বাবার দিকে তাকিয়ে হৃষীকেশ বলেন,—তোমায় দেখিনি আগে। জানি তুমি কে। শুনেছি তোমার সব কথা। তুমি আমার ছেলের প্রাণদাতা, আর সব ভুলে এইটেই জেনে রাখ্‌লাম। ফুর্তিতে এসো সকালে। কিন্তু বলো ত, কি করে টের পেলে তুমি?

—হুজুর, ভোর হয়ে যেতে মাঠে যাব বলে বেরিয়েছি, হঠাৎ কচি গলার আওয়াজ শুনলাম। হায়সা, যায়সা, না কি বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল যেন কে, তার পরই ঝপাং। তাকিয়ে দেখি খোকা বাবা, জলে হাবু ডুবু খাচ্ছে। খোকা বাবাকে আগে চোখে দেখিনি হুজুর, কিন্তু আজই বাসায় ফিরে ব্যাঙার কাছে শুনেছি। চিন্‌তে এক লহমাও লাগেনি হুজুর।

ঊষা একমাথা ঘোমটা টেনে এগিয়ে এসে নিভাননীকে ছাড়িয়ে নেয় হৃষীকেশের বাহু-পাশ থেকে। বলে,—চলুন, দিদি—কনার কাছে যাই।

ওঁরা দুজনে চলে যান। হৃষীকেশ বলেন,—হারুণ, চিঠ্‌ নিয়ে জাফর সাহেবের ওখানে যাও—এখ্‌খুনি। তিনি এসে দেখে যেমন বলবেন,—দরকার হলে ডাক্তার সাহেবের কুঠিতেও যেতে হবে। কাঞ্চনকে নিয়ে যাও—ফেরবার সময় ঘোড়া ডাক্তারকে দিয়ে, পায়দল ফিরবে।

হারুণ মাথা চুলকে বলে,—হুজুর—ডাগ্‌দর সাহেব বাইক চড়া শিখে গেছেন। ফিরতি রাস্তায় আমি পিনে দাঁড়িয়ে আস্‌ব—তাহলে হুজুর শিগ্‌গির হবে। আবার যদি সাহেব ডাক্তারের কোঠিতে যেতে হয়—

—শিখেছেন নাকি? তাহলে খুব ভালোই হ'ল। জল্‌দি যাও।

হারুণকে রওনা করে দিয়ে বাসায় ফেরেন হৃষীকেশ। আর যে যার নিজের বাড়ী ফিরে যায়।

কনখলকে শুইয়ে দিয়ে লেপ কম্বল চাপা দেওয়া হয়েছে। মাল্‌সায় আগুন জেলে হাতে পায়ে সেঁক দিচ্ছে ঊষা। নিভাননী ঠায় বসে আছেন মাথার কাছে, ডান হাতের নাড়ী ধরে। রহমৎ দুধ গরম করতে গেছে। ব্রাণ্ডি আছে বাড়ীতে—ডাক্তার এসে বললে তারপর

দেবেন, ঠিক করেছেন নিভাননী। কনখলের নিশ্বাস স্বাভাবিক—কিন্তু ঠিক্‌ ঘুম নয়, আচ্ছন্ন মতো হয়ে পড়ে আছে। হৃষীকেশ অস্থির পায়ে চুরোট মুখে সামনের বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারী করছেন।

ক্রিং ক্রিং ঘণ্টির আওয়াজ। অপূর্ব দৃশ্য। জাফর ডাক্তার গেট দিয়ে কম্পাউণ্ডে ঢুকলেন সাইকেলে—পেছনে পিনে দাঁড়ানো আয়েষা। ভোরের হাওয়ায় চুল উড়ছে। সাইকেল থাম্‌তে এক লাফ দিয়ে আয়েষা নেমে দৌড়ে কনখলের খাটের কাছে হাজির।

আয়েষা যেন পাগল হয়ে গিয়েছে। এসেই হ্যাঁচকা টানে ঊষাকে সরিয়ে দেয়। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব নিভাননী হাত ছেড়ে দেন ছেলের। মা যেমন ঘুমন্ত শিশুকে সর্বাঙ্গ দিয়ে নিজের বুকে টেনে নেন্‌, হুমড়ি খেয়ে তেমনি করে কনখলকে জড়িয়ে ধরে আয়েষা। কি করবে ঠিক করে উঠ্‌তে পারে না—গালে গাল লাগায়, মাথায় কপালে হাত দেয়, হাতের তেলো পায়ের তেলো বুকে মুখে ঘসে। চোখের জলে ভেসে যায় দুগাল। কনখল অচৈতন্য—তবু ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে অবিরাম ডেকে যায়—কংখ, কনু কনা ভাই! নিভাননীর চোখে আবার বান ডাকে—হাত বুলোন আয়েষার মাথায়, পিঠে। ধরা গলায় বলেন,—ঠাণ্ডা হ, ঠাণ্ডা হ—পাগলী মেয়ে! ভালো আছে, নিঃশ্বাস পড়ছে—

জাফর ডাক্তার এসে নাড়ী ধরে বসেন। পেটে টোকা দিয়ে দেখেন জল আছে কিনা। জিভ দেখেন—চোখের নীচ টেনে রক্তহীন হয়েছে কিনা পরখ করেন। ষ্টেথোস্কোপ দিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষার পর বলেন,—কিছু ভয় নেই। একটু সাড় হলে চায়ের চাম্‌চের দু চাম্‌চে ব্র্যাণ্ডি আর এককাপ গরম দুধ, মিশিয়ে খাওয়াতে হবে। সবটুকু পেটে গেলে, গায়ে জোর পাবে। হার্ট সাউণ্ড, অ্যাস্‌ফিক্সিয়ার ভয় নেই। তার পর, যদি দরকার হয়, ওষুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেব। এক্‌জস্‌সন। খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। একদিনেই ভালো হয়ে উঠবে।

মাথায় আঁচল টেনে ঊষা পাশের ঘরে যায়। নিভাননী যান দুধ ব্রাণ্ডির তদারকে। জাফর ডাক্তার হৃষীকেশ বাইরে গিয়ে বসেন। আয়েষা ঘর ছাড়ে না। দুহাতে কনখলের মাথা ধরে বসে থাকে ঠায় একদৃষ্টে মুখের দিকে তাকিয়ে—চোখের জলের ধারা শুকোয় না, পাৎলা দুখানি ঠোঁট যেন কি না-বলা কথা বলতে গিয়ে কাঁপতে থাকে।

বন্ধ শোবার ঘর থেকে ছেলে গিয়ে বাড়ীর পেছনের পুকুরে কি করে পড়ল বুঝে ওঠেন না নিভাননী। তাঁর সামনেই হারুণকে জেরা করে রহমৎ,—তুই শেষ রাত্তিরে কি বল্‌ছিলি কবরের কথা?

বাবুর্চিখানার ছাদে চিলে কোঠার মতো খুপ্‌রি আছে একটা। রহমৎ আর হারুণ সেখানটায় শোয়। ওখান থেকে মেমসাহেব আর বাচ্চাদের কবর তিনটে দেখা যায় ঝাউগাছের ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। হারুণ বলে,—বিহান হতে কতো দেরী দেখবার জন্য শেষরাতে জানলাটা খুলেছিলাম মা। সামনের কবরের ওপর কে যেন শুয়েছিল, মরাচাঁদের আলোয় দেখ্‌লাম উঠে হাঁটতে সুরু করল তলাওয়ের দিকে। মঙ্গলবার কিনা, তাই ভয়ে কপাট বন্ধ করে দিলাম, গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। হাঁটার ধরণটাও জ্যান্ত মানুষের মতো না, ঘুমচোখে হাঁটতে গেলে যেমন এলিয়ে পা পড়ে, তেমনি করে যাচ্ছে মনে হ'ল। খোকা বাবা হতে পারে, আমার একবারও মনে হয় নি মা,—

মঙ্গলবার? নিজেকে শত ধিক্কার দেন নিভাননী। কেন ছেলেকে জোর করে কাছে নিয়ে শুলেন না? প্রথম প্রথম শুতেন। হালে কনখল নিজেই আপত্তি জানিয়ে নিজের ঘরে একা শুত। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ান তিনি।

হারুণ বলে চলে,—রহমৎকে বললাম। রহমৎ আরও ভয় লাগিয়ে দিল। বলল, তুই একঠো মরদানা দেখিস নি, দেখেছিস দুটো খুকী। শুনে 'বিস্‌মিল্লা' বলে চাদর মুড়ি দিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম হুজুর। ভয় বেড়ে গেল।

কিন্তু মঙ্গলবার ত আরও গিয়েছে। এমন হয়নি কখনো। গোসলখানার দরজা খুলে বেরিয়ে গেছে কনখল নিশির ডাকে ঘুমের মধ্যে, এ ছাড়া আর কি হতে পারে বুঝে উঠেন না নিভাননী। কিন্তু ঘুমের মধ্যে হাঁটা চলা, এ রোগ ত ছিল না কনখলের। সব প্রথম এ সর্বনেশে বাড়ী ছাড়বার কথা বলতে হবে হৃষিকেশকে—সামনের মঙ্গলবার পর্যন্ত আর এ বাড়ীতে নয়। ছেলের অর্ধেক জীবন কাটে কল্পনার জগতে, জানেন তিনি। স্বপ্ন দেখে উঠে গেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার ডাকে? কার ডাক ফেলতে পারে না, কনখল? ব্যাঙার বাবার বর্ণনা মনে পড়ে। জলে ঝাঁপ দেবার আগে 'হায় সা, যায় সা', এম্‌নি কি যেন শুনেছিল সে। শিশির ভেজা গোলাপকুঁড়ির মতো আয়েষার কান্নারাঙা অশ্রুসজল ফুটফুটে মুখখানি মনে পড়ে যায়। সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকে না কার ডাকে ঘর ছেড়েছিল কনখল। হতাশ আক্রোশে মন গজ্‌রায়—তুই কি ওকে প্রাণে মারবি পোড়ারমুখি!

দুধ ব্র্যান্ডিতে এক চামচ মধু দিয়ে নাড়তে নাড়তে পেয়ালা নিয়ে ঘরে যান নিভাননী। নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তির মতো আয়েষা বসে আছে কনখলের মুখের দিকে তাকিয়ে—চোখে পলক নেই। দুটি হাত দু'হাতে ধরা। নিস্পন্দ কনখলের মুদিত চোখের পাতা একটু একটু কাঁপছে—জাগরণের সাড় ফিরে আস্‌ছে বোঝেন নিভাননী।

পেয়ালা টেবিলে নামিয়ে রেখে আয়েষার কানের কাছে মুখ নিয়ে যান। মনের পর্দা আজ নিঃসংশয়ে সরে গেছে—যত ছোটই হোক্‌ না কেন, আয়েষা আজ যেন তাঁর সমান সমান। অন্তরঙ্গ সখীত্বের পরমনির্ভর সুর বাজে তাঁর গলায়। মৃদু গলায় বলেন,—এই দুধটুকু ওকে খাইয়ে দিতে হবে যে এষা।

যেন বিদ্যুৎ-ছোঁওয়া চমকে শিউরে ওঠে আয়েষা। নিভাননীর ওই ছোট্ট কথাটুকুর একাত্মবোধ সঞ্চারিত হয় ওর মনে। এষা? আয়েষা নয়! নিভাননীর বুকের ভেতরটা পরিষ্কার হয়ে যায় ওর চোখে। দাঁড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরে বলে,—জাগ্‌লেই খাইয়ে দিচ্ছি মাসি।

আয়েষা হঠাৎ যেন অনেক বেশী বয়েসী হয়ে গিয়েছে। মাথায়ও ওঁর থেকে বড়ো, আবিষ্কার করেন নিভাননী। নিশ্চিন্ত গলায় বলেন,—তাহলে আমি ওদিক দেখিগে, তুই থাক্‌ এখানে।

—পাড়ার কাউকে এঘরে ভিড় করতে বারণ করে দিও মাসি। আর মেসোমশাইকে বলো বাবাকে বলতে, আমি আজ বাড়ী ফিরব না?

—তাই বলতেই আমি যাচ্ছিলুম রে পাগ্‌লি,—আজ তোর যাওয়া হয় কি করে?

শুধু আজ কেন, কোন দিনই যাতে আর না যেতে হয়, এই ব্যবস্থা করতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হতেন নিভাননী। কিন্তু পাগল হলেন নাকি,—মনে হঠাৎ তীব্র বেদনা অনুভব করেন তিনি। হরিণ কখনো সোনার হয়? তবু রামের ভুল হয়েছিল। ভুলের সুখটুকুও যতক্ষণ সত্যি, ততক্ষণ তার স্বাদ গ্রহণে বিরত থাকতে চায় না তাঁর মন। আজ কি ছেলে-মানুষ হয়ে গেলেন তিনি? ভুলের ডাকেই ছেলে প্রাণ দিতে বসেছিল, চকিতে পড়ে যায় যায় তাঁর মনে। কিন্তু সত্যিই কি ভুল? এত ভালোবাসা, ভালো লাগা, সব যদি ভুল, তবে বিশ্বসংসার চলছে কিসের ওপরে?

এত বুঝেও কেন ঈর্ষার ভাব উঁকি দেয় মনের আনাচে কানাচে, আজ সত্যিই বিব্রত বোধ করেন নিজেকে। ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে যেতে যেতে বলেন,—ভালো হয়ে উঠুক, সব শুনিস্‌ লোকজনের কাছে। আমার কেমন যেন মাথার ঠিক নেই।

—কিচ্ছু শোনার দরকার নেই আমার। আমি এসেছি, ও ভালো হয়ে উঠ্‌বেই।

কার কাছে পেল এই মেয়েটা এমন নিশ্চিত আশ্বাস—যে ও এসেছে, অতএব কনখল ভালো হয়ে উঠ্‌বেই? হিংসা হয় নিভাননীর। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার স্নেহধারায় মন ভিজে যায়। আবার ভুলে যান, যে আয়েষা উদ্ভিন্নযৌবনা পরমরূপবতী রমণীরত্নই শুধু নয়,—ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কোনো দ্বেষের ভাব রাখেন না মনে। শুধু বলেন, গলায় মধু ঢেলে বলেন,—জানি।

বলে আয়েষার মাথায় হাত দিয়ে, একটু থেমে, ভেতরে চলে যান, যেন নিঃশব্দে আশীর্বাদ বর্ষণ করে যান বুক উজাড় করে।

কনখলকে চোখ মেলতে দেখে বুক থেকে একটা ভারী জিনিষ যেন গলা দিয়ে ঠেলে উঠতে চায় আয়েষার, কষ্টে আত্মদমন করে। প্রায় স্বাভাবিক সুরেই বলে,—কখ্‌, কনা ভাই—জেগেছিস্‌?

চোখ মেলেছে, কিন্তু জাগে নি কনখল। মানে, ঠিক জাগে নি। দৃষ্টি তখনো স্বপ্নালু। আয়েষাকে চিনতে পারে। যেন অনেক দূর থেকে কথা বলছে, এমনি করে বলে,—মেয়ে দুটো ভালো আছে ত রে? বেঁচেছে? বলে আবার চোখ বোজে। আপন মনে বিড় বিড় করে বলে যায়,—ভাগ্যিস সাঁতারটা শিখিয়ে দিয়েছিলি তুই। তা না হলে কি পারতুম ওদের তুলতে। তুই গামছা টানটান করে ধরার কথা বলতে যেই তাকিয়েছি তোর দিকে, ওই ফাঁকে কখন জলে নেমে পড়েছে দুষ্টু মেয়ে দুটো।

একটি বর্ণও বোঝে না আয়েষা। ভয় পেয়ে যায়। বেশী অসুখে আবোলতাবোল বকে লোকে, তাকে বিকার বলে। তাই হোলো না ত কনার? কিন্তু জ্বরজ্বালা ত নেই, ভালো আছে—বলে গেছেন বাবা। তবে? আত্মবিশ্বাসে আর আস্থা আসে না আয়েষার, ভাবে মাসিকে ডাকি এইবার।

নিভাননী যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন দেখে নি। তিনি গিয়ে কনখলের মাথা কোলে নিয়ে বসেন। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করতে বলেন আয়েষাকে। কনখন বিড় বিড় করে বকে যায়,—তবু ভাগ্যিস্‌ তুই ডেকেছিলি, তাই না যাওয়া হোলো। না গেলে ত মেয়ে দুটো জলে ডুবেই মরে যেত। কিন্তু তোর হাত কি ঠাণ্ডা রে আয়েষা, জলে মাছ ধরতে নেমেছিলি, তাই। না রে?

আয়েষা তাকায় নিভাননীর দিকে, চোখের ইঙ্গিতে কথা বলতে বারণ করেন তিনি। আয়েষা নিভাননীর গালে পর পর দুটি হাতই ছুঁইয়ে দেখায় যে ওর হাত আদৌ ঠাণ্ডা নয়। একটু হাসির আভাস ঝিলিক দেয় নিভাননীর ঠোঁটে।

এবার কনখল সত্যিই জেগে ওঠে। খালি জাগা নয়, উঠে বসে একেবারে। ছোট ছেলের মতো মার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল, টের পেয়ে ভাবে, কি হোলো রে বাবা! আয়েষাটা অমন করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে কেন? ওকি সাত রাজার ধন মাণিক, যে দেখে দেখে আশ মিটছে না? হাসতে যায়, একটা ক্লিষ্ট মুখভঙ্গী করা হয় মাত্র। লাফ দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে, নিভাননী বারণ করবার আগেই আয়েষা ফেটে পড়ে,—হয়েছে হয়েছে। বসে থাক্‌। নড়বি না। বীরপুরুষ! বাড়ীসুদ্ধ সবাইকে দাঁতকপাটি খাইয়ে দিয়ে মজা

করে ধিঙ্গিপনার মৎলব হচ্ছে! ওকে শক্ত করে ধরে রাখো মাসি, আমি দুধটা দিই।

আয়েষার একী কথার ধরণ? মাকে ও ধমকাচ্ছে? ওই কি বাড়ীর গিন্নী নাকি? মাও ত ছোট্ট খুকীটির মতন পিট্‌পিট্‌ করে হাস্‌ছেন! আয়েষাটা এলোই বা কখন, আর এসেই সবার ওপর তম্বী করা সুরু করে দিল কেন, বুঝে উঠ্‌তে পারে না ও। দুধের কাপ কাছে আনতে মা বলেন,—খেয়ে নে কংখ্‌।

—বা রে—বিছানায় শুয়ে খাই কখনো? উঠি, হাত মুখ ধুই, তা'পর চলো খাবার ঘরে—

—ঐ দুধটুকু এইখানেই খেয়ে নে।

—ওতে বিশ্রী গন্ধ—ও আমি খাব না মা।

—গন্ধ ত একটু হবেই কংখ্‌, ওতে যে ওষুধ মেশানো আছে। কাল রাতে তোর শরীর খুব খারাপ হয়েছিল কিনা, তাই ভোরবেলা ডাক্তার সাহেব আর আয়েষা এসেছেন। ঐটুকু খেয়ে তুই এখানেই আয়েষার সাথে গল্প কর, আমি দেখিগে খাওয়া-দাওয়ার জোগাড়।

মাথার ঝিম্‌ঝিম্‌ এখনো আছে। হাল ছেড়ে দিয়ে দুধটুকু এক চুমুকে খেয়ে নেয়। ঝাঁজ লাগে খেতে, এত মিষ্টি, তবুও। কিন্তু চট্‌ করে চাঙ্গা হয়ে ওঠে যেন। বুকের কাছটায় একটুক্ষণের জন্য সামান্য জ্বালা করে।

কাপ ভেতরে পৌঁছে দিয়ে আয়েষা এসে পাশে বসে। কনখলের দু'হাত নিজের হাতে চেপে ধরে বলে,—আমার হাত বুঝি ভীষণ ঠাণ্ডা?

—কৈ, না ত।

—তবে এতক্ষণ বক্‌ছিলি কি? আমি তোকে ডাকলাম কখন কাল রাতে? কোন মেয়ে দুটো মরে যেত তুই জল থেকে না তুললে? সাঁতার শেখালাম কবে আমি তোকে? সব কথা শুনে তবে আমি ছাড়ব তোকে, বুঝলি বাঁদর? থাক্‌, থাক্‌, চন্দন করতে হবে না যাদুর। ঠাণ্ডা হয়ে বসুন ত বাছাধন—

ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে প্রায় বুকে পিষে কনখলের দু'গালে চুমো খায় আয়েষা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে কনখলের মুখে। ও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে বসে থাকে। এ মেয়েটা কেন যে একসাথে বকাঝকি করে, আবার ফুঁপিয়ে কাঁদে!

নিজের চোখ মুছে সরে আসে আয়েষা। বেশ জাঁতিয়ে বসে', পায়ের ওপর দোসুতি টেনে নিয়ে। বলে,—কনা ভাই, বকেছি বলে কিছু মনে করিস্‌ না। আজ আমি এখানে থাকব, মাসি বাবাকে বলে দিয়েছে। এখন একটু ঘুমো তুই, আমি তোর গায়ে হাত বুলিয়ে দিই। তারপর যখন যেমন মনে পড়ে, সব খুলে বলিস্‌ আমায়, কেমন? ঘুমো এখন নিশ্চিন্তি হয়ে—

রাতে একটা বিপর্যয় হয়েছে, সেই তার নায়ক, এই বোধ ধীরে ধীরে জাগে কনখলের মনে। পরিষ্কার কিছু মনে নেই। যতটুকুও বা মনে পড়ে—সেও কাটাছেঁড়া একটানা নয়। আশ্চর্য, হুকুম পাবার সাথে সাথে ঘুমও পায় কনখলের। আয়েষাকে দ্যাখে খানিকক্ষণ চোখ ভরে', তারপর বালিশে মুখ গোঁজে। বাঁ হাত দিয়ে জড়িয়ে রাখে আয়েষার কোমর।

নিভাননী এলে তাঁর কানে কানে বলে আয়েষা,—ঘুমোতে বলেছি। ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোনো ভালো, না মাসি?

—হ্যাঁ মা, ঘুমই ত ওষুধ এখন, তোর বাবাও তাই বলেছেন। তুই পাশ থেকে উঠিস্‌ নে, তাহলে আবার জেগে যাবে। কুলসমকে বলতে বলে দিয়েছি তুই আজ এখানে

থাকবি। নড়ছিস্‌ কেন—ওঃ, মায়া, মায়ার মা, উষা ওরা এসেছে? তা আসুক। কংখ্‌ এখনো আমার কাছে শুলে অমূনি করে জাপ্‌টে ধরে' শোয়। এই যে দিদি, চলুন ও ঘরে যাই আমরা। একটু জেগেছিল, এক ফোটা দুধ খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আয়েষা থাকুক, কথা বলিগে চলুন। আয়েষা-অন্ত প্রাণ, যেন আয়েষাই ওর সব, আমি কেউ না!

রক্ত খাওয়া পেটফুলো জোঁকের মতো উষার দুখানি পুরুষ্টু ঠোঁটের বাঁকা হাসি লক্ষ্য করেন না নিভাননী, কিন্তু আগুনঝরা চোখে আয়েষা তাকিয়ে দেখে, যেন পারলে ভস্ম করে দেবে ওই অশুচি, অমঙ্গলময়ীকে। কনখলের গায়ের চাদর গোছ করে দিতে গিয়ে আড়াল করে তাকে, আগ্‌লে রাখ্‌তে চায় পাপের অশুভস্পর্শ থেকে।

নাকের ডগা ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে,সোজাপিঠ, বাঁকাগ্রীবা,—যেন জীবন্ত একখানা শাণিত বাঁকা তলোয়ার। অপলক চোখে তাকিয়ে দেখেন নিভাননী। যেন সিংহিনী। না সিংহ-বাহিণী? তেমনি দৃপ্তা, তেমনি মহিমময়ী। আর সবাইকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় মনে হয় যেন দিব্য আবির্ভাবের মতো একা আয়েষাই ঘর আলো করে রেখেছে।

১৪

ক্লান্ত, দুর্বল হয়ে গেছে কনখল। সেরে উঠেছে, তবে গায়ে জোর পায়নি। দুদিন স্কুলে যাওয়া হয়নি, আরো বেশ কিছুদিন হবে না। ছেলের দল, পাড়াপড়শী, প্রথম দিন থেকে আনাগোনা করছে, খোঁজ-খবর নিচ্ছে, পারতপক্ষে ঘরে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছেন না নিভাননী। আয়েষার বাড়ী ফেরা হয়নি। ওর মা আপত্তি করেননি, এক বাড়ীর মতোই ত ছিলো সেদিন পর্যন্ত। দরগার ইমাম সাহেব এসে কপালে হাত ঠেকিয়ে কনখলকে দোয়া করে গেছেন।

আয়েষা পাহারাদারনীর মতো অষ্টপ্রহর ও ঘরে। নিভাননীকে সুদ্ধ শাসন করছে। ওষুধ পথ্য ওর হাতে খাচ্ছে কনখল। নিভাননীর এক এক সময় মনে হয়েছে বুঝি উনি নিজেই আয়েষার রূপ ধরে ছেলের পরিচর্যা করছেন। মজা লাগছে আয়েষার মা-গিরি দেখে।

টুক্‌রো টুক্‌রো কথা আর খবরে ভর করে নিশির ডাকে কনখলের ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার কাহিনী একটি সামগ্রিক রূপ নিয়েছে। খবর পরিবেশক কনখল নিজেই প্রধান। কিছুটা জাগরণে, কিছুটা আধঘুমে, একটু একটু করে অনেক কথা বলেছে ও। বাকী কিছু বলেছে, হারুণ, রহমৎ ও ব্যাণ্ডার বাবা। গোসলখানার দরজা খুলে বেরিয়ে যাবার চাক্ষুষ সাক্ষী আশ্চর্যভাবে দাঁড়িয়ে গেছে মায়া। গোল্লাছুটের ময়দানের পর প্রাচীর, তারপর রাস্তা, তার ওপারেই বিদ্যাভূষণের বাড়ী। মায়া ভোর রাতে শোবার ঘরের খোলা জানালা বন্ধ করতে উঠেছিল হাওয়া হিমেল হয়ে উঠেছে বলে। দেখেছে কনখলকে বেরোতে, ঘুমের মধ্যে যদি কেউ হাঁটতে যায়, তেমনি অবিন্যস্ত পায়ে। যাচ্ছিল বাবুর্চিখানার দিকে, তাই মনে কোনো খটকা লাগেনি। ওর পরেই তিনটে কবর যদিও। উষাকে আড়ালে বলেছে, একটুও সন্দেহ হলে ও নিশ্চয় এগিয়ে আস্‌ত লজ্জাসরমের মাথা খুইয়ে। শুনে উষা ঠোঁট উলটে বলেছে, ওসব ছেঁদো লজ্জাহায়ার ধার সে ধারে না,—ঘুমের মধ্যে হাঁটছে মনে হলে সব ফেলে সে ছুটে আসত কনখলকে রুখ্‌তে।

আয়েষাই স্বপ্নবিহারের নায়িকা, এ তথ্য উদ্ঘাটন করে নিভাননী আদৌ অবাক হন নি,

ছেলের মনোজগতের সাথে তাঁর অপরিচয় নেই। কিন্তু আকর্ষণের আকুল প্রকাশে ভাবিতা হয়েছেন। কনা শিশু না হলেও এখনো সাবালক হতে ঢের দেরী। মুখে কিছু ভাঙেন নি তিনি এমন কি হৃষীকেশের কাছেও না। শুধু সবার অগোচরে তীক্ষ্ন সন্ধানী চোখ মেলে আছেন আয়েষার বুকের দিকে। সেখানে কি কোনো তোলপাড় উঠ্‌ছে? সব কথা শুনেছে আয়েষাও, বোঝবার বয়স তার হয়ে গেছে। আয়েষা কনাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। সে ভালোবাসা কী রূপ নেবে এসব কথা জানবার পর? সৌহার্দ্যের নিঃশঙ্ক দাস্যপনার সাথে অনাবিল মাতৃস্নেহের মিলন সকৌতুকে দেখেছেন নিভাননী। এবার?

আগে ভাগে কোনো পাত্তা না দিয়ে কে যেন এসে আয়েষাকে ব্রীড়াময়ী করে দিয়েছে। কনার সাথে চোটপাট করে চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলার বদলে কে যেন ওর মুখ দিয়ে মিষ্টি কোমল কথা বলিয়ে নিচ্ছে। ঘুমন্ত কনখলের দিকে তাকিয়ে আয়েষা ভাবে, একি দুদিন আগেকার কনাভাই, না বড়ো একজন কেউ। পথ্য দিতে গিয়ে গায়ে ঠেকে গেলে গা শির-শির করে উঠ্‌ছে, এরকম আগে ত কখনো হয়নি। এইত সেদিন এক ঘর লোকের সামনে ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় ভরে' দিয়েছিলো, কে'দে ভাসিয়েছিলো,—সে কথা মনে পড়তে আকর্ণ লাল হয়ে উঠ্‌ছে আয়েষার।

বিব্রত বোধ করছে দেহটাকে নিয়ে। খাটো ফ্রক ইজের ছেড়ে নিভাননীর সাড়ী জামা পরেও যেন আব্‌রু সামাল দেওয়া যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে। অথচ দিনের মধ্যে অনেক বার লুকিয়ে মাসির ঘরে বড়ো আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আসতে ভালো লাগছে। শুধু অবাধ্য অঙ্গসৌষ্ঠবেই যে বিকাশ সীমিত ছিল, কনখলের নৈশঅভিযানে কল্পনাসঙ্গিনী হওয়ার গুপ্তকথা জেনে ফেলার পর যেন তার সাথে মনেও রং লেগে, সুরভিসঞ্চার হয়ে, পুরন্ত বস্‌রাই গোলাপের মতো পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আয়েষা।

অপরিসীম আত্মবিশ্বাসে মন ভরে উঠেছে। সান্নিধ্য এখন অবান্তর, অনাবশ্যক ঠেকছে। যেন জেনে নিয়েছে, মনের বিচিত্র নিগূঢ় কয়েদশাল থেকে মনোচোরের মুক্তির আর কোনা পথ খোলা নেই। কনখলের চৌকী থেকে বেশ দূরে, চেয়ারে বসে ওর ঘুম-জড়ানো কচি মুখটির দিকে তাকিয়ে আছে অপলক চোখে। মনের ওপরপাতে বোনা হয়ে যাচ্ছে ছলনাময়ী ললনার কলাকৌশলের ফন্দী-ফাঁদ। নিভাননীর সজাগ চোখের প্রহরা এড়ানোর ফিকির। টানাপোড়েনের মেঘ ও রৌদ্র লুকোচুরী খেলছে মনের মধ্যে।

এতদিনকার স্বচ্ছন্দ সহজ দিনগুলোর আঙিনায় যেন সঙ্গোপনে কে একজনা দেয়ালের আড়াল তুলে কোঠা ভাগ করছে। সে, আর ও, যে একই মানুষ,—এ কথা কি দুদিন আগে নিজেই জানত আয়েষা?

নিভাননী এসে ডাকেন,—ওঠ্‌, নাওয়া খাওয়া করবি চল। ও সব পাট চুকিয়ে আবার এসে বসিস খন। কখ্‌ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

আয়েষা যে বিছানা থেকে বেশ তফাতে আলাদা চেয়ারে বসে আছে, দেখ্‌তে ভুল হয়নি নিভাননীর। ওঁর ডাক যেন মুক্তির হাঁফ্‌ ছাড়তে দেয় আয়েষাকে। সে বলে,—চলো মাসি। কিন্তু চেঁচিয়ো না, আস্তে কথা বলো। দেখ্‌চ না, সবে ঘুমিয়েছে। উঠে পড়বে আবার।

—আয়ি বুড়ি একেবারে—না কি যে বলে, আদ্যিকালের বাদ্যিবুড়ি, যেন কতো ছেলে মানুষ করে' পাকাপোক্ত হয়ে উঠেছেন! বলে হেসে ফেলেন নিভাননী।

তা তো হয়েইছে,—অনেক ছেলে মানুষ নাই বা করল!

কথার জবাব দেয় না আয়েষা। ধীর পায়ে মাসির সাথে চলে আসে। আগের মতো

চাপল্য, কি রঙ্গপ্রিয়তার কোনো পরিচয় পান না নিভাননী। এ যেন আরেক মেয়ে। যেন উপল বাহিনী ক্ষীণ উচ্ছল ঝরণাধারা গভীর দহে আত্মনিমজ্জনের পর গতিবেগ সংহত করে ভরানদীতে রূপান্তরিতা হতে চলেছে, বেলাপ্লাবিনী আজ অন্তঃসলিলা।

কনখল বিছানায় পড়ে' থেকে আর দুটি প্রাণীর অভ্যস্ত জীবন যাত্রায় বিশৃঙ্খলা ঘটিয়েছে। একজন কাঞ্চন। প্রথম দিন সকালে দানার বালতিতে মুখ ডোবাতে গিয়ে সতৃষ্ণ চোখে শুধু এদিক ওদিক তাকায়। চামরের মতো ল্যাজ দুলিয়ে, ঘাড়ের কেশর কাঁপিয়ে, সামনের দু' পা দিয়ে খটখট শব্দ করে, হারুণকে জানিয়ে দিতে চায় যে কেবল পেট ভরলেই খাওয়ার তৃপ্তি পুরো হয় না, খাওয়ার সময়কার প্রাত্যহিক সাথীর উপস্থিতিও একান্ত আবশ্যক। পরের দিন দানার বালতিতে মুখ ছোঁয়াতেই চায় না। লম্বা গলা কাঁপিয়ে 'চিঁ' হি হি' শব্দে আবেদন জানায় অনুপস্থিত নিত্যসঙ্গীর পুনরাবির্ভাবের প্রত্যাশায়।

ওর মনের কথা হারুণ বোঝে না। ভাবে ঘোড়ার তবিয়ৎ ঠিক নেই, সাহেবকে বলতে হবে জানোয়ারের ডাক্তার ডাকিয়ে ইলাজ করাতে। জলভরা কুচোনো খড়চানার বালতি ঘুরিয়ে নানাভাবে চেষ্টা করে খাওয়াতে, কাঞ্চন মুখ ফিরিয়ে নেয়। যেন হারুণের বোকামিতে দিক্‌দারী বোধ করে, খোকাবাবা এসে গায়ে হাত না বুলিয়ে দিলে, চোখের সামনে না দাঁড়ালে, ওর যে খেতে একটুও ইচ্ছে করছে না, এই সহজ কথাটা বান্দার মাথায় কেন ঢুক্‌ছে না ভেবে অশান্ত হয়।

আর একজন ব্যাঙা। শুক্‌নো মুখে কনখলের শোবার ঘরের বাইরে জানলার নীচু আল্‌সেয় হেলান দিয়ে বসে চোরকাঁটার শীষ চিবোয়। একটি একটি করে নিপুণভাবে ছোট্ট চালের মতো শাঁস বা'র করে; দাঁতে কেটে আবার থু থু করে ফেলে দেয়। ভেতরে গিয়ে খোঁজ খবর নেবার সাহস ওর নেই। ওর খোঁজও কেউ করে না। আপন মনে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া কোনো কাজ পায় না। মনে মনে অনেক কিছু করার ফর্দ বানায়—সেগুলো কনখল ভালো হয়ে উঠ্‌লে একটির পর একটি করে যেতে হবে সঙ্কল্প করে। তার মধ্যে প্রথমটি অতি সাধু—মানে, কনখলকে সাঁতার শেখানো। সাঁতার জানে না বলেই ডুব্‌তে যাচ্ছিল। কিন্তু মনে খট্‌কাও আছে, এই কাণ্ডের পর ওর মা কি ওকে জলে নাম্‌তে দেবেন! মাকে রাজী করাতে পারে এক আয়েষা দিদি। তার কথা মা, কি সাহেব, কেউ ঠেলতে পারবে না, স্থির জেনেছে ব্যাঙা। তাই করতে হবে; আয়েষাদিদিকেই মুরুব্বী পাকড়াতে হবে। কিন্তু নিজে বলবে কি করে? আয়েষার সাথে ত ওর তেমন ভাব নেই। ঠিক্‌ হয়েছে, রহমৎকে দিয়ে বলাবে আয়েষাকে,—চাচা বলে ডাকে, শুনেছে ব্যাঙা। বাকী কাজগুলো এমন কিছু নয়, সে ধীরে সুস্থে করলেও হবে।

ব্যাঙার বাবাকে কাজ দিয়েছেন বাগচি। সুপারিশের দরকার হয়নি সে রাত্রে কনখলকে বাঁচানোর পর। আবেগপ্রবণ মানুষ, তখুনি দশটাকা বক্‌শিশ করতে যাচ্ছিলেন, নিভাননী থামিয়েছেন। চেনেন স্বামীকে। বলেছেন যাতে পরিবারটার স্থায়ী উপকার হয় এমন কিছু করতে। টাকা দুদিনেই ফুরোবে, তারপর ব্যাঙার বাবা আবার চুরী ধরবে। তার চেয়ে মাসব্যবস্থায় কাজ দিলে সৎপথে চলবার উপায় করে দেওয়া হবে। এ সুযুক্তি মেনেছেন বাগচি। আস্তাবল সাফ্‌ করবার কাজে বহাল হয়েছে নন্দলাল। বিদ্যাভূষণ, হরেনবাবু,—শুনে' আপত্তি তুলেছিলেন। প্যারীবাবু ইদানীং আসা কমিয়েছেন, তবে তাঁর তৃতীয়পক্ষ মারফৎ নিভাননীও প্রতিকূল মন্তব্যই শুনেছেন। কিন্তু গায়ে মাখেননি।

হরেনবাবুর সাথে বাগচির হৃদ্যতা হয়েছে। 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে এসেছেন

দুজনে। বাগচি বলেন,—দেখ হরেন, জন্মচোর হয়ে কেউ আসে না পৃথিবীতে, অভাববোধের সাথে সামাজিক নিষ্ঠুরতা মিশে অপরাধীর সৃষ্টি হতে থাকে। ধর নন্দলাল লোকটা। মোটামুটি সৎগুণ সবই আছে। স্ত্রী ছেলের জন্যে ভাবে, সাহসী, পরিশ্রমী। শুনেছি যখন আগে কাজ করত, চুরী করত না। সাহেব ডাক্তার চলে যেতে কাজ গেল, অপর কেউ দাগী বলে ওকে কাজ দিল না। আবার চুরী ধরল। ছেলের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে আমি কৃতজ্ঞ, সে কথা না হয় ছেড়েই দাও। শুধু মানুষ হিসেবেই ওকে একটা সুবিধে দেওয়া উচিত মনে হয়, যাতে আর পাঁচজনার মতো বেঁচে থাকতে পারে।

হরেনবাবু মাথা চুলকোন। দু একবার ঘাড় দুলিয়ে বলেন,—হ্যাঁ, তা কথাটা অযথার্থ বলোনি। ফরিয়াদীর উকীলের সওয়ালের জবাবে বিবাদীপক্ষের গুছানো উত্তর হয়েছে। জজে মানবে একথা। কিন্তু ব্যাপার কি জানো, আমরা নিজেরাই হীনমনা হয়ে যাচ্ছি। যে কোনো কারণেই হোক্, নন্দ যদি আবার চুরী করে, অথবা, ধরো, ও কিছু নাই করলো—দৈবাৎ পাড়ায় একটা চুরী হয়ে গেল—সেক্ষেত্রেও আমরা বন্ধুরাই হয়ত বলব, যে বাগচি হিতকথা না শুনে একটা চোর পুষেছে।

বাধা পেলে উত্তেজিত হয়ে ওঠা বাগচির স্বভাব। ঝাঁজালো গলায় বলেন,—বলে বলুক আর ঘরের ভাত বেশী করে খাক। অভাবে পড়ে একটা লোক সমাজের বার হয়ে যাবে, আর ক্ষমতা থাকতেও আমরা কিছু করব না, এটা অত্যন্ত নিন্দনীয় মনোভাব।

বিদ্যাভূষণ রসসঞ্চার করে বলেন,—অর্থাৎ প্রাকৃতকে কিঞ্চিৎ সাধুভাষার প্রলেপ দিয়ে বলা যেতে পারে যে সমাজবাসীরা মোটামুটি 'ভাত দেবার ভর্তা নন্, কিল মারবার গোস্বামী'। কেউ নিজের ঘাড়ে দায়িত্ব নিতে চায় না, বুঝলে হরেন,—সবাই নির্ঝঞ্ঝাটে সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে চায়। যুগের হাওয়া এই দিকেই বইছে। বাগচির সুস্থ সবল মনে এখনো আদর্শভঙ্গের জরা আক্রমণ করেনি। করতে দাও ওকে যা চায় তাই।

সর্বান্তঃকরণে বাগচির মতের সমর্থন হরেনবাবুর মনে। কিন্তু মুখে বলেন,—যা বলেছেন দাদা। যা মতলব করেছো তাই করো হে সাহেব, ঘা খেতে খেতে তবে ত আমাদের মতো ঝুনো হয়ে উঠবে। তবে অন্দরে ঢুকতে দিয়ো না, ঐ বাইরে বাইরে যা করবার, করুক।

—ভেতর বাড়ীর কাজ ত দেব না, নন্দ খালি আস্তাবলের কাজ করবে।

প্রসংগ ঘুরিয়ে দেন হরেনবাবু। বলেন,—বাড়ী বদলের মতলব আছে নাকি এখনো?

—থাকলেই বা পাচ্ছি কোথায়। হ্যাসেটকে বলেছিলুম নিরাপদ জায়গায় একটা বাংলোর জন্যে। তেমন বাড়ীই নেই বর্তমানে। তবে বলেছে যে পুজোর পর জয়েণ্ট দুটো কোথায় যেন সেটেলমেণ্ট ক্যাম্পে যাবে, ঐ পুলিশ হাসপাতালের টিলার বাসাটাই আবার পেতে পারি।

ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে কনখল যথারীতি মজলিসের গল্পগুজবে কান খাড়া করে রেখেছিল—বিশেষ করে প্রকাশদাদের সম্বন্ধে কোন কথা হয় কিনা শুনবার ইচ্ছেয়। শরীর দুর্বল—ওঠা এখনো বারণ। কিন্তু বাবার শেষ কথাটুকু শুনে ওর সমস্ত দৌর্বল্য গেল উবে—এক লাফে নেমে অন্দরে ছুট—

—মা, মা,—আয়েষা শোন্—মা গো, কোথায় তুমি—

বিকেলের চুলবাঁধার আসর দুদিন বসেনি। মা রান্নাঘরের দাওয়ায় চা জলখাবার সাজাচ্ছেন—ঠাকুর দিয়ে আসবে বাইরে। আয়েষা উঠোনে গাঁদাগাছগুলোর পাশে মোড়ায় বসে আছে। কনখলকে পাগলের মতো ছুটতে, আর 'মা, মা' করে আর্তনাদ করতে দেখে ধড়মড়িয়ে দাঁড়ান নিভাননী।

—কি, কি হয়েছে কংখ্—কাঁপ্‌ছিস্ যে—

সাপ্‌টে ধরেন ছেলেকে। নিজে বসেন, ওকে বসান। আয়েষা উঠে দাঁড়ায়—একটি কথাও বলে না; শুধু ঠোঁটদুটো হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে যায়—অসহায় ভাবে তাকিয়ে থাকে।

—না কাঁপিনি। শোনো মা, ভীষণ ভালো খবর। বুঝলি মুখপুড়ি—কি দিবি বল্! বাবা নিজে বলেছেন। মা গো—পুজোর পর হবে কবে? কন্দিন আছে আর পুজোর?

স্বাভাবিক রং ফিরে আসে আয়েষার মুখে। নিভাননী বোঝেন, ছেলের কোনো দুঃসংবাদ নয়। বলেন,—বোস্ ত ঠাণ্ডা হয়ে। হ্যাঁরে, তোর না ওঠা বারণ? আজ খাবি আয়েষার কাণমলা। কিন্তু খবরটা কি শুনি?

—পুজোর পর—বুঝলে মা—আমরা যাব আবার সেই বাড়ী—সেই বাড়ী—সেই বাড়ী—নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্রায় গানের সুরে বলে কনখল।

—অত দাপাস্ নে—মাথা ঘুরবে। বোস চুপ করে। কিসের বাড়ী, কোন বাড়ী, খোলসা না করে বললে বুঝব কি করে?

—পুজোর পর আমরা আবার পুরোনো বাড়ীতে যাব—আয়েষাদের পাশের বাড়ী। বুঝলে?

ছেলের আনন্দের কারণ আঁচে বুঝেছিলেন নিভাননী, তবু বলেন,—সে ত এখন জয়েণ্ট সাহেবদের বাংলা। তারা যাবে কোথায়?

—সে জানিনে—ক্যাম্পে না কোথায় যেন যাবে পুজোর পর। হ্যাসেট সাহেব বাবাকে বলেছে, সে ত আর মিথ্যে বলবে না? তুই যে একদম চুপ আয়েষা, তোর মজা লাগছে না?

আয়েষা সত্যিই নির্বাক হয়ে আছে। বিদ্যুৎ ঝিলিক খেলছে চোখে, মুখেও ঈষৎ হাসির রেখা উঠেই মিলিয়ে যাচ্ছে—কিন্তু চট্ করে বলে না কিছু। বেশ ধীর স্থির গলায় জবাব দেয়,—লাগছে বৈকি। এখানে ছিল পুকুর, ডুবে মরতে গিয়েছিলি। ওখানে গেলে সুরু হবে পোলো, ঘোড়া থেকে পড়ে হাড়গোড় ভাঙ্‌বি। আমার হয়েছে জ্বালা, কোনদিক যে সাম্‌লাব—

বলে ধীরে সুস্থে উঠে রওনা দেয় ঘরের দিকে। নিভাননী আয়েষার পাকাপাকা কথা-বলার ধরনে হেসে ফেললেও ভাণ-টুকু তাঁর চোখ এড়ায় না। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি। কনখল তড়াক করে উঠে আয়েষার এক হাত ধরে ঝাঁকি দেয়, টানতে টানতে ঘরে নিয়ে দুহাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরে বলে,—এমন খবর শুনেও মুখ গোম্‌ড়া করে রইলি তুই!

এইবার আয়েষা কনখলের কপালের চুল আঙুল দিয়ে নেড়ে দিতে দিতে বলে,—তুই কি ছেলেমানুষ রে! একদম পাগলা! ভালো লাগছে না? তুই বুঝতেই পারবি না আমার কতো ভালো লাগছে। তাই বলে মা মাসীর সামনে লাফাবো নাকি তোর মতো? আমি এখন বড় হয়ে গিয়েছি না?

—এক দু দিনে কেউ বুঝি বড় হয়ে যায়? ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে আমাকে। আসলে তুই আর খুশী নোস্ আমরা ফিরে যাব শুনে। তাই না রে?

আয়েষার চোখ দিয়ে জল পড়ো পড়ো দেখে হতবাক্ হয় কনখল। আয়েষা চোখে আঁচল ঢেকে নিভাননীর কাছে ফিরে গিয়ে কোলে মাথা লুকিয়ে কাঁদে। পেছন পেছন গিয়ে কনখল দাঁড়ায়। মা বলেন,—কি হোলো আবার দু'জনে? ভালো হয়ে উঠলেই খুনসুড়ি আর ঝগড়া ঝাঁটি—

—শুনছো মা—ঝগড়া টগড়া কিচ্ছু হয়নি। আয়েষা বলে কি, যে আমরা ফিরে ঐ বাসায় যাব জেনেও আগেকার মতো খুশী হতে পারছে না ও, এখন নাকি বড় হয়ে গিয়েছে—তাই আমি বল্‌লুম—

কনখলের পায়ে ছোট্ট করে লাথি কসিয়ে দেয় আয়েষা। কনখল তিড়বিড় করে ওঠে—দেখ্‌লে, দেখ্‌লে তোমার আহ্লাদীর কাণ্ড? দাঁড়া তবে—

নিভাননী সামাল করেন ছেলেকে, জড়িয়ে আয়েষাকে আরও কোলে টেনে নিয়ে বাঁচান কনখলের উদ্যত আঁচড় কামড় থেকে। বলেন,—তুই কি বুনো হয়ে যাচ্ছিস্ রে কংখ্! মেয়েলোকের গায়ে হাত তুলতে আছে কখনো?

—আয়েষা বুঝি মেয়েলোক? ও ত মেয়ে খালি! আর, পাজী আর দুষ্টু মেয়ে।

—তা ত বটেই রে—এই দুদিন পাখীর ছানার মতো কে বুকে করে রেখেছে তোকে? ঘুমের মধ্যে ঠোঁট ফাঁক করে কে ওষুধ পত্তর খাইয়েছে? কে সারারাত ঘুমোয় নি, ঠায় মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থেকেছে? আজ গায়ে একটু বল পেয়েই তারই সাথে লাগাচ্ছিস্ এসে! তুই কি অকৃতজ্ঞ রে কংখ্!

সেবা শুশ্রূষার ফিরিস্তি শুনে অপ্রতিভ হয়ে ঢোক চেপে কনখল। থতমত খেয়ে বলে,—তবে কেন আমরা ও বাড়ী ফিরে যাব শুনে ও খুশী হয়ে লাফিয়ে উঠল না? কেন মিছেমিছি বলল যে ও এখন বড় হয়ে গিয়েছে! যতো সব—দুষ্টুই ত, খুব দুষ্টু—

বলতে বলতে দৌড়ে পালিয়ে যায় নিজের ঘরে। গিয়ে বালিশে মুখগুঁজে পড়ে' থাকে।

চোখ মুছে' নিভাননীর কোলের ভিতর থেকে আয়েষা মাথা তোলে।

—আমি ত সত্যিই বড়ো হয়ে গিয়েছি মাসি! আচ্ছা, তুমিই বলো, ওর সাথে তাল রেখে নাচ্‌লে কুঁদ্‌লে মানায় এখন আমাকে?

নিভাননী একটু অদ্ভুত হেসে যেন আপন মনেই বলেন,—বড়ো হওয়া থামিয়ে আবার ওর সমান সমান হবার চেষ্টা কর দেখি, স্বস্তি পাবি। চল্, চুল বেঁধে দিই গে—আজ আবার ফিরতে হবে তোকে রে, খেয়াল আছে?—মনে মনে ভাবেন তিনি, প্যাঁচামুখো হওয়া কত সহজ এ জীবনে। খুশীতে ফেটে পড়া কতো কঠিন!

আয়েষা ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ, আছে। মুখভাব মোটেই বেজার দেখায় না। বেশ শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটির মত চুল বাঁধতে যায়।

বিছানায় শুয়ে চুপচাপ ভাবে কনখল। বড় হওয়া মানে কি পর হয়ে যাওয়া? দূরে চলে যাওয়া? তাহলে মা, বাবা, এত নিজের কেন, কাছের কেন? ওঁরা ছাড়া আয়েষাই ওর সবচেয়ে আপন। না হয় হোলোই বা বড়! তাই বা কখন হোলো, কি করে হোলো, বুদ্ধি দিয়ে নাগাল পায় না। আচ্ছা, ধরাই যাক্, বড় হয়েছে। তা' বলে পর হয়ে যাবে?

বেশ। সেও বড় হবে এখন থেকে। 'পর পর' হবার খেলায় দেখিয়ে দেবে আয়েষাকে এক হাত। আলাদা করে ছিনিয়ে নেবে নিজেকে সব ভালো লাগার লোভ থেকে। হার মানবার ছেলে সে নয়। অমৃত বলেছিল, জীবন ভোর কত মার খেতে হবে। এও কি মার? মারই ত! লাগছে যে, ভীষণ লাগছে! বুক ফেটে যাচ্ছে!

শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে কনখল। রুদ্ধ অভিমানে ঠোঁট দুটো ফুলেই থাকে। জানতে পারে না, কখন কে এসে ওর ঘুমন্ত কপালে দুটো কম্পিত নরমঠোঁটের স্পর্শ বুলিয়ে দিয়ে যায়, রেখে যায় অবিন্যস্ত চুলের রাশে কান্নারাঙা একজোড়া চোখের ঝরঝরে কয়েক ফোঁটা জল।

১৫

কাজীর বাজারের আগুন কবে থেমে গেছে, শহর শান্ত স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। বিপিন বেণী খুঁচিয়ে আবার জ্বেলে তুল্‌ছে নেভা আগুন, প্যারীবাবু ঢালছেন ঘী।

বিকেলের মজলিশে হরেনবাবু তীব্র ভাষায় বলেন,—এখনো ব্যাপারটা ধোঁয়াটে আছে তোমাদের কাছে? বুঝলে না সাহেব, এক আঁটি ভিজে পাট—এক টিন কেরোসিন—একটা দেশ্‌লাই-এর কাঠি। ব্যস্। ম্যারিনফায়ার কোম্পানীর কাছ থেকে কড়কড়ে ত্রিশহাজার নগদ, সেই সাথে যারা বিয়েতে বাগড়া দেবার জন্য কোমর বেঁধেছিল, তাদের শ্রীঘর বাস,—God Save the King!

মজলিশ মানে ওঁরা তিনজন, হরেনবাবু, বিদ্যাভূষণ আর হৃষীকেশ। প্যারীবাবু একদম আসা বন্ধ করেছেন। কনখল শুনেছে উনি নাকি আজকাল দারোগা পুলিশ উকীল মোক্তারদের দরজায় ধন্না দিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভেতর বাড়ীতে উষা আসে, কিন্তু সে উষা আর নেই। হাসিখুশী চলাচলি উবে গেছে, সবায়ের মধ্যে কেমন যেন ছাড়াছাড়া হয়ে থাকে। আগে ওকে আড়ালে পেলেই এগিয়ে আস্‌ত অন্তরাটিপ্পনি কাট্‌তে—এখন দেখা হলে শুধু বোকার মত হাসে—নিষ্প্রাণ ফিকে হাসি।

নিকটতম প্রতিবেশী সম্বন্ধে হরেনবাবুর রূঢ় সত্যভাষণ অপ্রিয় বোধ হয় হৃষীকেশের। যদিও অভিযোগগুলির প্রত্যেকটিই যথার্থ বলে মনে মনে মানেন তিনি। একদিন এ মনোভাব প্রকাশ করেওছিলেন নিভাননীর কাছে। বলেন,—হতে পারে, কিন্তু হরেন, যে ব্যাপারটা এখনো তদন্তসাপেক্ষ, এবং পরে হয়ত মামলার বিষয় হয়ে দাঁড়াবে, তা নিয়ে আগেভাগে চরম ফতোয়া দিয়ে দেওয়া একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?

—তোমাকেও ত জিজ্ঞাসাবাদ করেছে নর্টন?

—হ্যাঁ,—আমি যতটুকু দেখেছি, বলেছি। আগুন লাগার কার্যকারণ কিছুই জানিনে। নেভানোর বিলিব্যবস্থা করেছি, ব্যস্ এইটুকু!

—কিন্তু কি শুনেছ না শুনেছ, তাও ত জানতে চাইবে?

—চেয়েছে। শোনা কথা বলব না স্থির করেছিলাম, বলিও নি। চোখে যা দেখেছি তার বাইরে কোনো এজাহার আমি দিই নি।

—আমাদের ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুকে ডেকেছিল কেন?

—নিবারণের কথায়। নিবারণ ছেলেটি অত্যন্ত গরীব, জানো বোধ হয়। রাত্তিরে সমাজমন্দিরে রাতপাহারার কাজ করে, কিছু পায়। তাই দিয়ে আর জলপানী পেয়ে পড়াশুনা চালায়। নিবারণ বলেছে যে সে আগুনলাগার রাত্তিরে সর্বপ্রথম প্যারীবাবুর গুদাম জ্বলে উঠ্‌তে দেখেছে। সে তখনো রাত জেগে পড়ছিল। প্রথমে ব্যাপারটা বুঝে উঠ্‌তে পারেনি—আগুন আশে পাশে ছড়িয়ে পড়তেই সে দৌড়ে পরেশবাবুর বাসায় গিয়ে তাঁকে জাগিয়ে ঘটনা জানিয়ে সাহায্যের জন্য লোক ডাকতে ছোটে। পরেশবাবু মনিব, তাঁকে না জানিয়ে পাহারা ছেড়ে মন্দির থেকে যেতে পারে না বলে প্রথমে তাঁকে খবর দিয়েছে।

—পুলিশের কেস্ ত ঠিক্ উলটো। নিবারণ এবং তার দলের অর্থাৎ গীতা সোসাইটির পাণ্ডারাই নাকি বিলিতী কাপড়ের দোকানে আগুন লাগায়, তার থেকে বাজারে ছড়িয়ে পড়ে।

—পরেশবাবুর কথায় সে কেস্ ভণ্ডুল হয়ে যাবে মনে হয়। তিনি বলেছেন, নিবারণ ত খবর দিতে ছুট্‌ল, তিনি মন্দিরে এসে আগুন দেখলেন প্যারীবাবুর গুদামে, ও তার আশ-

পাশের দুচারখানা দোকান ও গুদামঘরে। বিলিতী কাপড়ের দোকান আগুন থেকে সাত আটটা ঘর পরে—আগুন তখনো সে পর্যন্ত পৌঁছয়ই নি।

—তাহলে ত কেস্ সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াচ্ছে—

—তা ত দাঁড়াচ্ছেই। শুনলুম, কলকাতা থেকে বিলিতী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর একটা সাহেব এসেছে ক্ষতির পরিমাণ তদারক করতে। রবার্টসনের বাসায় আছে। প্যারীবাবু খেসারৎ বাবদ যে টাকাটা দাবী করছেন, অত টাকার পাট তাঁর মজুত ছিল কিনা খোঁজ খবর নিচ্ছে। প্যারীবাবু নাকি এফিডেবিট করেছেন পঞ্চাশ হাজার কত টাকা কত আনার পাট ছিল।

—এফিডেবিট করে থাকলে হিসেব পত্তরও আছে। দাগ বই আর জাবেদা থেকে ঠিক প্রমাণ করে দেবেন 'খন। রসিদ ভাউচার তৈরী করবার বহুৎ টাইম পেয়ে গেছেন।

বিদ্যাভূষণ এইবারে ফোড়ন কাটেন,—'অল্পস্য হেতোর্বহুহাতুমিচ্ছন্ন, বিচারমূঢ়ো-প্রতিভাসি মে ত্বম'।

—ত্রিশ হাজারের বীমা কি অল্প হোলো ভট্‌চায? আর বিচারমূঢ় কাকে বলছো হে, এ যে ফৌজদারী—ফাঁসীদ্বীপান্তরের ব্যাপার। অবিশ্যি যদি সন্দেহ ঠিক হয়।

হরেনবাবু অভিজ্ঞ উকীল হলেও কথার তোড়ে মাত্রা হারান। তাঁর মন্তব্যে বিচলিত বোধ করেন আর দুজনা। এই সময়ে দেখা যায় প্যারীবাবু আসছেন, তাঁর সঙ্গে বিপিন কার্লাইল। বিদ্যাভূষণ টিনের কৌটো খুলে আর এক দফা তামাক সাজেন, কল্‌কের মাথায় টিকে ধরিয়ে গাল ফুলিয়ে ফুঁ দিতে থাকেন, চোখ থাকে আগন্তুকদের দিকে। তাঁরা এসে বসবার পর প্রথম প্রথম একটা অস্বস্তিকর নীরবতা থম থম করতে থাকে।

কইয়ে বলিয়ে মানুষ হরেনবাবু। কথা তোলেন,—এই যে, খবর বার্তা কি ম'শায়, ব্যাপার ত বেশ ঘোরালো হয়ে উঠ্‌ছে শুনি।

—না না, ঘোরালো আর কি। তবে জোর তদন্ত চালাচ্ছে বটে পুলিশ।

—শুনলুম নাকি ফকির সন্ন্যাসী কাউকে রেয়াৎ করছে না, সবায়েরই তলপ পড়ছে?

—ফকির সন্ন্যাসী? কই, তাত কিছু জানি নে।

—ঐ একই হোলো, প্রচারক পরেশবাবুকে নাকি ডেকেছিল নর্টন। চোখ বুঁজে ভজন-পূজন করেন, একপ্রকারের সন্ন্যাসীই বলা চলে তাঁকে।

পরেশবাবুর উল্লেখে প্যারীবাবু অপ্রসন্ন হন। উত্তেজিতও। বলেন,—যত সব বুজরুক, বুঝলেন মশাই! করছেন ত চোখবুঁজে নিরাকার ফক্কিকারের উপাসনা, তা করুন। তা নয়, ইনিয়েবিনিয়ে যা মনে চায় বলে এলেন ঐ দেড়ে ভদ্রলোক। আরে ম'শাই, নিবারণ ছোঁড়া আগুন দেখে ছুট্‌ই যদি লাগালো, তোমাকে সাত তাড়াতাড়ি তার বৃত্তান্তই বা বলতে যাবে কেন, আর তাই করে কেউ? একটা বাজার পুড়ছে দাউ দাউ করে, তখন 'জল আনো, জল ঢালো' করবে, না বানিয়ে গল্প করতে যাবে আর এক বাড়ী? বিপিনবাবু ঠিক এ'চেছেন—তলে তলে ঐ ভণ্ডতপস্বী বোমার দলের লোক না হয়ে যায় না।

হৃষীকেশ ভয়ানক চটে যান। পরেশবাবু সম্বন্ধে অশিষ্ট উল্লেখ অমার্জনীয় লাগে। রাগ চাপবার চেষ্টায় ঠাট্টার সুরে বলেন,—এই ত আবার কথাবার্তা সিভিশনের লাইনে যাচ্ছে। স্ত্রীশিক্ষা, সমাজ সংস্কার, থিওসফি, হ্যালীর ধূমকেতু, করোনেশন—সব চলবে মশাই আমার এখানে, কিন্তু বোমাবারুদ চলবে না।

হরেন বলেন,—সত্যিই ত। বেচারা 'বাবু'র বর্বরতা থেকে 'মিষ্টারের' মিষ্টত্বে পৌঁছবার

জন্যে প্রাণপাত করছে এখন, আর তার বাসায় কিনা—

—বড়ো বাজে বকো হে হরেন, জিভ্ নয় ত আরবী ঘোড়া! তারপর, বিপিনবাবু, আপনার ঝঞ্ঝাটও ত কম যাচ্ছে না। স্কুলের কাজকর্মের পর এ সব নিয়ে ছোটাছুটি—

মুখফোঁড় হরেন চিপটেন কাটেন,—আদো 'অব্যাপারেষু' নয়, বরং 'সমব্যাপারেষু'। স্কুলে ছেলে পড়ান, এখন সাক্ষী পড়াচ্ছেন। আমাদের রুজি রোজগার গেল আর কি। তা কজনকে ভেড়ালেন মশাই, যারা স্বচক্ষে নিবারণদের আগুন লাগাতে দেখেছে?

বিষপিঁপুড়ের কামড়ের মত হরেনের কথায় জ্বলতে থাকেন বিপিনবাবু। কিন্তু তিনি গভীর জলে লীলাখেলার জীব। হাতের তেলো ঘষ্‌তে ঘষ্‌তে টিক্‌টিকির ল্যাজের মতো গোঁফের ডগা জিভ দিয়ে চাটেন। মুখে 'চুক' করে একটু আওয়াজ করে গলায় মধু ঢেলে বলেন,—কী যে বলেন সারু, আপনারা উকীলরা হলেন অ্যাজিটেটর, আপনাদের দেখে ইংরেজ ডরায়। আমরা হলুম গে চুনোপুঁটি ক্লাস, তবে রাজভক্ত। যথাসাধ্য রাজপূজা করি,—মানে ডিউটি হিসেবে,—

—আর ডিউটি হিসেবেই বলির জন্যে কচিপাঁঠা সংগ্রহ করে বেড়ান। কী হিড়িকই আন্‌লে ক্ষুদিরাম! মাফ্ করো সাহেব, আর বলব না। তা বিপিনবাবু, সে গল্পটা জানেন তো? যার হাতে খাঁড়া, বলির সময় সে বে-এক্তার হলে কি হয়? মহেশ মাতালের নাম শোনেন নি বোধ হয়, একবার কালীপুজোর পাঁঠা ছেড়ে ধরুনীর ধড়মুণ্ডু ফারাক করে দিয়েছিল। দেখবেন, কচি ছেড়ে ধাড়ীর গলায় কোপ না পড়ে।

হৃষীকেশ বোঝেন হরেনকে থামানো যাবে না। তেজী, খাঁটি মানুষ সে, তার উপর ভেতরে ভেতরে তেতে উঠেছে। চট্ করে বুদ্ধি মাথায় আসে—কথার মোড় ঘুরিয়ে দেন। বলেন,—শুনেছ হরেন, আরে তোমাকেও ত বলা হয় নি। বড়দিনের আগেই দিল্লীতে দরবার হচ্ছে জানো ত? মহামান্য সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী—সে এলাহী ব্যাপার। স্থানীয় আমীর ওমরা ওদের নামের ফর্দ চেয়ে পাঠিয়েছে ঢাকা থেকে। বড়লাট হার্ডিঞ্জ তাঁদের শাহ্‌জাঁহার সাথে ভেট্ করিয়ে দেবেন, চাই কি, করমর্দনের সুবিধেও করে দিতে পারেন। ভীষণ সম্মানের ব্যাপার। শিলেট থেকে তিনটে বেসরকারী নাম চেয়েছে—দু'জন মুসলমান।

—তা হলে ত হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড হে! ঐ যে তোমাদের গ্রন্থাবলীর কোম্পানী বিজ্ঞাপন দেয়—এবার পূজায়, থুড়ি, বড়দিনে গুদাম সাবাড়! তা, নাম পাঠানোর মালিক ত হ্যাসেট?

—আর কে হবেন,—উনিই যখন জেলার মালিক।

হ্যাসেট বাগচির বাসায় আসেন, মেশেন, কনখল-নিভননীর সাথে খানাপিনা করেন, এসব সমাচার সুবিদিত। অ-মুসলমান দরবারীটি নিজেও হতে পারেন, এ দুরাশা আছে প্যারীবাবুর। দরবারের গোপন সংবাদ অজানা নয় ওঁর। আদত কথা, সেই বিষয়েই একটু বাজিয়ে দেখবার জন্যে আজকে আগমন। বলেন,—মালিক হলে কি হয়, আপনাকে খুব স্নেহ করেন। জানি, আর নিজ চোখেই দেখছি ত সব! যা দহরমমহরম আপনার সাথে,—

মনোগত অভিপ্রায়টি অব্যক্তই রাখতে চান তিনি, কিন্তু নাছোড়বান্দা হরেনবাবু ছোঁ মেরে বক্তব্যটি খুঁটে বার করে বলেন,—অতএব, দাও প্যারীবাবুর নামটা সুপারিশ করে। তা মন্দ কি হে বাগচি—রাজভক্তিতে প্যারীবাবুর জোড়া মেলা ভার, অবিশ্যি বিপিনবাবু ছাড়া—

বিপিন কার্লাইল চালাকের হদ্দ। সবিনয়ে নিবেদন করেন,—মশাই, দরবার হোলো উচ্চস্তরের ব্যাপার—রাজাগজার মজ্‌লিশ। আমরা দূর থেকে ভক্তি জানিয়েই সন্তুষ্ট,—যথাস্থানে যদি পৌঁছয়, জীবন সার্থক মানি।

—অর্থাৎ দীন ভৃত্য। প্রভুর ছেঁড়াছুটো শালটা লপেটাটা ইনাম পেলেই খুশী। এক ফরাসে মাইফেলে বসবার এলেমদার নই। হক্ কথা। এ কথা জজে মানবে। তা, আমি খালি ভক্তির দিকটাই তুলনা করছিলুম।

বিপিনবাবুর সাথে দরবারী তক্‌রার অযথা মনে হয় প্যারীবাবুর। সোজাসুজি হৃষীকেশকে জিজ্ঞেস করেন,—নাম বাছাই কি হয়ে গেছে?

—কি করে জানব বলুন, খোদ কর্তা নিজে এসব করছেন। এ পর্যন্ত আর কারো সাথে সলাপরামর্শ করেছেন বলে শুনিনি। খবরটা জানি, আপিসে আর সবাই যেমন জানে,—এই টুকু।

—তা হলেও ফাইন্যাল করার আগে কি আর আপনাদের সাথে আলাপ আলোচনা হবে না—হবেই। এখন কথা হচ্ছে যে প্রথম লিস্টে কার কার নাম থাক্‌ছে, সেইটে জানা দরকার,—

বলে চুপ করে যান প্যারীবাবু। কাছারীর আমলাকারকুনের কাছ থেকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করবার কলকাঠি জানা আছে তাঁর। হাকিমহুজুরে জাহির করবার মতো বিদ্যা নয় সেটা।

এমন সময় দেখতে পাওয়া যায় পুলিশ সাহেব চলেছেন টম্‌টম্ হাঁকিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের মোড় ঘুরে বন্দর বাজারের রাস্তায়। সাথে আর একটা সাহেব, চেনাজানা স্থানীয় অফিসার কেউ নয়। নিজেরাই গল্প করতে করতে যায়, বাগচির বারান্দার দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না। টম্‌টম্ অদৃশ্য হয়ে যাবার পরও বিপিনবাবু আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে হাতের মুঠো কপালে ঠুকে ঠুকে কুর্নিশ্ জানাতে থাকেন।

হরেনবাবু বলেন,—থামুন ম'শায়, গাট্টা খেয়ে কপাল ফুলে উঠ্‌লো যে! ওরা আদপেই এদিকে তাকায়নি, আর এখন ত চলেই গেছে।

—হেঁ হেঁ—আমার সঙ্গে একটু ইণ্টিমেসি আছে কিনা,—মানে, খবরটা আস্‌টা দিতে যাই ত কখনো সখনো, তাই—ধরুন না, আবার যদি অফেন্‌স্ নিয়ে বসেন—

প্যারীবাবু ছাড়া আর সবাই হেসে ওঠেন। বিদ্যাভূষণ বলেন,—ইস্কুলে ইন্‌স্‌পেক্টর এলেও কি এমনি সেলামের বহর ছোটান?

—তা সাহেব হলে করতে হয় বৈ কি,—ওরা হোলো রাজার জাত। আর পুলিশ সাহেব ত কাঁচাখেগো দেবতা, আজকালকার জ্যান্ত বিগ্রহ। বলা ত যায় না কিছুই, সেলাম না করাটাই হয়ত নোট করল। কিন্তু সঙ্গে ওটা কে,—নতুন বলে মনে হোলো যেন,—

—কোনো হালের আমদানী প্ল্যাণ্টার হবে হয় ত। আমরাও চিনি নে।

হৃষীকেশ জানেন কে ওটি। রবার্টসনের বাসায় উঠেছে কলকাতা থেকে আসা ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহেব। নর্টনের সাথে এ পাড়ায় দেখে আন্দাজও করেন কারণ। মজুত পাটের এন্‌কোয়ারী। ভাঙেন না কিছু মুখে। শুধু বিস্মিত হন প্যারীবাবু খোঁজখবর রাখেন না দেখে। অথচ প্যারীবাবুর সমস্ত দাবীদাওয়া নির্ভর করছে ঐ সাহেবটির তদন্তের ওপর।

—মুসলমানদের মধ্যে কারা থাক্‌বেন? আপন মনেই জিজ্ঞেস করেন প্যারীবাবু। সাহেবদের বিষয়ে ভাবেন না কিছু। হরেনবাবু বলেন,—আপনার মাথায় দরবারী কাড়ানা-কাড়ার বাদ্যি বাজ্‌ছে বুঝি? তা', গণিমিঞা ত একজন বটে, আর একজন সম্ভব পাঁচআনীর মজ্‌মাদার। কি বলো হে বাগচি?

বাগচি কিছুই বলেন না। নেভা চুরোটে দুটো বিফল টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলেন।

বিদ্যাভূষণ বলেন,—ওঠা যাক্, সন্ধে আহ্নিকের সময় হোলো। সাহেব সুবো আর আমীরওমরাদের নাম জপে ইডেন-বেহেস্তের পথ সাফ্ করো তোমরা, আমি যাই, বৈতরণী পার হবার কড়ি সঞ্চয় করিগে। যাবে নাকি হরেনভায়া,—চলো।।

ওঁরা দুজন উঠে গেলে প্যারীবাবু খাটো গলায় হৃষীকেশকে বলেন,—হরেনবাবুর কাঠখোট্টা বচনগুলো বড়ো বিশ্রী, বাগ্‌চিসাহেব। আর বিপিনবাবুর ওপর উনি যেন জাতক্রোধ।

—আরে না, না—ওর রসিকতাই অম্‌নি! মধু ঢালার সাথে হুলও ফোটাতে ছাড়ে না। আর উকীল মানুষ কিনা, বকে একটু বেশী। তা' ওরাইত হল আজকাল পাব্লিক ওপিনিয়ন। অ্যাজিটেশন বলুন, ডেপুটেশন বলুন, ওরাই হোলো লীডার।

—সেটা সত্যি কথা। হালে গভর্ণমেণ্ট বরদাস্তও করছে এসব। পার্টিশনও নাকি রদ হয়ে যাবে বলছেন ওঁরা। কার্জনের সেট্‌ল্‌ড্ ফ্যাক্ট নাকি নাকচ হয়ে যাবে।

চাকুরের পক্ষে দৃশ্য প্রসঙ্গ আবার উঠে পড়ছে দেখে হৃষিকেশ অশান্ত হয়ে ওঠেন। বলেন,—হয়, হবে। আমরা যা করছি, তাইই করে যাব, অর্থাৎ চাক্‌রী। কাজ কি রাজনীতির দাবা খেলার চাল ভেবে?

—তা ঠিক্, তা ঠিক। বিপিনবাবু যেন কি বলতে চেয়েছিলেন বাগ্‌চি সাহেব কে? বলে ফেলুন এইবার, এখন নিরিবিলি আছেন।

—না, মানে খবরটা শুন্‌লুম আর কি। এ বাড়ীতে খেলাধুলো করতে আসে অমৃত বলে একটি ছেলে। পুলিশের খাতায় তারও নাম আছে।

—অমৃত? ও, হ্যাঁ। সেত ছোট ছেলে? সে আবার কি করল?

—করেনি কিছুই, করেনি কিছুই। তবে করতে কতক্ষণ, এই আর কি! গীতা সোসাইটি বলে যে ধর্মসভাটি আছে না—ওই প্রকাশ নিবারণ যার সভ্য, ওটির ওপর নজর আছে সরকারের। ওখানে ত নিছক ধর্ম আলোচনাই হয় না, স্বদেশী প্রচারও চলে। ওখানকার স্বামীজির চেলার দলের একজনা বলেই অমৃতর নামটার কথা উঠেছে। 'গুরুজী কি জয়' ডাক শুনে যারা আগুন নেভাতে এসেছিল, অমৃতও তাদের একজন। তবে হ্যাঁ, পালের গোদাদের মধ্যে ও কেউ নয়—সে হল প্রকাশ, নিবারণ—এরা।

রাগে, ঘৃণায়, বিষিয়ে ওঠে হৃষীকেশের মন। এই শয়তান লোকটা ইনফর্মার হিসেবে ছেলে ক'টির নাম দিয়ে এসেছে পুলিশে,—পরিষ্কার বুঝতে পারেন। তীব্র বিদ্বেষ দৃষ্টি হেনে তিনি কঠোর কণ্ঠে বলেন,—বুঝেচি। আচ্ছা—জেনে রাখ্‌লুম। এবারে আসুন তাহলে,—

—এই যে, এই যে উঠ্‌ছি আমরা।

দু'চার পা গিয়ে প্যারীবাবু একা ফেরেন। হৃষীকেশ রাগে গজরাতে গজরাতে পায়চারী করছেন—কাছে এসে বলেন,—সুবিধে পেলেই সাহেবকে আমার কথাটা একটু—মানে ঐ যে দিল্লীর দরবার না কি যেন—আপনাকে আর খুলে বলার কিইবা আছে—

—উঃ! বিস্ফোরণ চাপেন বাগ্‌চি। মুখ দিয়ে কটুকাটব্য ফুটে বেরোতে চায়। চেপে, দাঁতের ফাঁক দিয়ে বলেন,—অফ্‌কোর্স!—গুড্ নাইট।

পাশের ঘর থেকে কনখল শুনে রাখে শেষের দিকের কথাগুলো। এইটুকু শুধু বোঝে, যা শুনেছে, সে খবরটা প্রকাশ নিবারণ অমৃতর কানে ওঠা দরকার, এবং সেটা জরুরী।

মার সাথে বাবা কথা বলছেন দুটো ঘর পরে খানাকামরায় বসে। বাবার গলার

আওয়াজ থেকে থেকে চাপা গর্জনে ফেটে পড়ছে। কি বলছেন ওঁরা, শুনতে ইচ্ছে করছে খুব, কিন্তু আড়ি পাতার নীচতায় মন সায় দেয় না। কাছে গিয়ে বস্‌তে বাধা নেই। তবুও কেন যেন বাধবাধ ঠেকে। তা ছাড়া, কালকের স্কুলের পড়া আছে, খাতা বই ঝেড়েঝুড়ে রুটিন মিলিয়ে গোছ করতে হবে।

হরেনবাবুর কচি পাঁঠা আর মহেশ মাতালের বলির গল্প কানে এসেছে, মাকে বলতে হবে। জানতে হবে পুরোপুরি গল্পটা।

সেই কবে আয়েষা বাড়ী ফিরে গেছে, ও তখন ঘুমিয়ে। কদিন আর আসে নি। 'পর পর' হয়ে থাকার সঙ্কল্প মিইয়ে আসে একা ঘরে। দূর থেকে তাকে নিজের সমান কল্পনা করে আনন্দ পায়, কিন্তু মনের কোণে ভয়ের খোঁচ্ জেগে থাকে, যে কাছে এলে বুঝি বড়োই হয়ে যাবে আয়েষা, চলে যাবে ওর নাগালের বাইরে। এক গোছা চুল হাতের আঙুলে জড়াতে জড়াতে পড়ার টেবিলে মাথা গোঁজে কনখল, কিন্তু মন বসে না, দুলতে থাকে আশা নিরাশার দোলায়। আঁকের প্রশ্নমালা খুলে অঙ্ক করতে বসে, ভুল হয়ে যায়। ভূগোল বইয়ের সৌরজগত অধ্যায়ে ইউরেনস্ নেপচুন পৃথিবী সব একসাথে তালগোল পাকিয়ে ঘুরতে থাকে সূর্যকে ঘিরে, কাউকে থামানো যায় না। 'ধুত্তোর' বলে উঠে রওনা দেয় মার কাছে।

সেদিনকার সান্ধ্যবৈঠকের উদ্দীপ্ত আলোচনা থেমে গিয়ে এখন সুরু হয়েছে ব্যাঙার বাবার কথা। এবার যে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে নন্দলাল, সে এক সর্তে। রাতভোরে সিপাই-এর ডাকে সাড়া দেওয়া চাই। ভোর বলে ধরাবাঁধা নিয়ম কিছু নেই যদিও। রোঁদের পুলিশ টহলদারী করতে তিন চার ঘণ্টা অন্তর এ পাড়া ও পাড়ায় হানা দেয়, কোনদিন রাত বারোটায়, কোনদিন তিনটেয়। ডেকে দেখে যাবার নিয়ম, নজরবন্দী দাগী বাড়ীতে আছে কি নেই। মাঝরাতের হাঁকডাকে ঘুম ভেঙে গিয়ে ভারী অশান্তির কারণ ঘটছে নিভাননীর। বাড়ী বদলের আশু কোন সম্ভাবনা নেই জানবার পর রাত্তিরে শুচ্ছেন কনখলকে সঙ্গে নিয়ে। একটিই মঙ্গলবার গেছে সেই ঘটনার পর। সে রাত ত তিনি জেগেই কাটিয়েছেন। নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয়নি কনখলের, এই যা বাঁচোয়া। কিন্তু রাতবিরেতে হেঁড়ে গলায় 'নন্দ্‌লালোয়া হো' বিকট হুঙ্কারে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে রোজ। আর খালি হুঙ্কার ত নয়, তারপর গজুর গজুর, ছিলিমটানা, চলেছে ঘণ্টাখানেক ধরে। তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছেন তিনি। ব্যাঙাদের বাড়ীটা যদিও বেশ দূরেই—পুকুরের ওপারে জঙ্গলের মধ্যে। তবুও রাত নিশুতিতে শব্দের যেন পা গজায়, ঠিক্ এসে পৌঁছে যায় কানের কাছে জ্বলাতে।

কনখল এসে গুটিসুটি মার পাশে বসে, যখন কথাটা তোলেন নিভাননী। হৃষীকেশ বলেন,—কি আর করা যাবে বল, উপায় নেই। মুচ্‌লেখা লিখে দিতে হয়েছে যে রাত্রে ঘরে থাকবে। এখন, থাকে, না চুরী করতে বেরোয়, পুলিশ নিয়মিত খবরদারী করবে—এই কড়ারে ছাড়া পেয়েছে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগে।

—তবে কি আজীবন এই চলবে নাকি?

—না না, এরও মেয়াদ আছে, তবে লম্বা। তা ছাড়া স্থানীয় পদস্থ লোকের কাছে এনকোয়ারী করে নজরবন্দীর লিষ্ট থেকে নাম কেটে দেবার ব্যবস্থাও আছে।

—তবে তাই করিয়ে দাও না, রোজ রাত্তিরে ঘুমভেঙে অস্বস্তিভোগ আর সইতে পারছি না।

—আরে এখনো ত দিন দশেকও হয়নি, এত শিগ্‌গির কি আর হয়ে উঠ্‌বে! আচ্ছা, যাক্ মাসখানেক, হরেনকে বলে একটা আর্জি করিয়ে দেখ্‌খন।

—আচ্ছা আইন বাপু তোমাদের! পাড়ার লোকের ঘুম ভাঙিয়ে চোরের ওপর চোখ রাখা!

নিভাননী অপ্রসন্ন মুখ করেন। কনখল ভাবে, এর ত খুব সহজ উপায় আছে। ব্যাঙার বাবা রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ে বলেই না পুলিশ চেঁচামেচি করে পাড়া জাগায়। যদি নন্দলাল নিবারণের মতো রাত পাহারার কাজ পায় তবে ত তাকে আর ডেকে ওঠানোর কথাই থাকে না। সে জেগেই থাকবে, পুলিশও জানবে সে জেগে আছে, খালি টহল দিয়ে দেখে যাবে। মার বাঁ হাতের সোনা বাঁধানা নোয়াটা এক হাতে ধরে অন্য হাতে আর দু'গাছা চুড়ী ঘোরাতে ঘোরাতে তাঁর কানে কানে বলে কথাটা। বলবার সময়ে উৎসাহে উস্‌খুস্ করে, কিন্তু বলা হয়ে গেলে বোকা বোকা মুখ করে নিভাননীর মুখের দিকে তাকায়। বুক দুরুদুরু করে দেখে মার চোখে তারিফের ঝিলিক উঠ্‌ল কিনা।

মা কিন্তু সত্যিই প্রশংসামুখর হয়ে ওঠেন, বলেন,—এইত! কংখ্ ছিল বলেই না! এমন সহজ রাস্তা থাকতে আমরা কিনা ভেবে মরছি!

হৃষীকেশ চায়ের পেয়ালা নামিয়ে গোঁফ মুছে ডগায় চাড়া দিতে দিতে বলেন,—বটে, সমাধানটা কি বেরোল তাহলে?

—অতি সহজ। আজ থেকে নন্দলাল রাত চৌকীর কাজ করবে। জেগে বাড়ী পাহারায় থাকলে দুপুর রাতে হাঁকডাক চেঁচামেচির ল্যাঠা আর থাকবে না। মাইনে টাকাদুয়েক বাড়িয়ে দিতে হবে নিশ্চয়ই। আস্তাবল আর বাবুর্চিখানার খিদ্‌মৎ ব্যাঙা একাই পারবে।

হাসিতে ফেটে পড়েন হৃষীকেশ।—ডাইনীর হাতে ছেলে! দাগী চোরের হাতে ঘুম-পুরী! এর চেয়ে সহজ উপায় আর কি হতে পারে!

প্রস্তাবের এই হাস্যকর দিকটা নিভাননীর মনেও যে কৌতুক সঞ্চার করেনি, তা নয়, কিন্তু কপট গাম্ভীর্য বজায় রেখে তিনি বলেন,—কেন নয়? বিশ্বাস করে কেউ কোনোদিন ঠকেছে নন্দলালের কাছে? পেটের দায়ে চুরীচামারি করে, এ সবাই জানে। কাজ থাকতে অসৎ পথে যায় না, এও অজানা নয়। আমার ছেলেকে সেদিন নিশ্চিত ডুবে মরা থেকে বাঁচিয়েছে, ও যাবে আমাদের অনিষ্ট করতে? এই তোমরা বিচারক? আমি বলছি, এ কখনো হতেই পারে না।

নিভাননীর গলার আওয়াজ থেকে ভাণের ছোঁয়াচ কেটে যায়। আন্তরিকতায় সতেজ হয়ে ওঠে শেষের কথাগুলো। বলে চলেন,—ওকে বিশ্বাস করে দেখেছে কেউ, যে ও বিশ্বাসের পাত্র কিনা? মানুষকে খারাপ করে মানুষ। উঠ্‌তে বস্‌তে চোর বলে ঠেলে রেখে শেষ পর্যন্ত পাকা চোর বানিয়ে ছাড়বে ওকে। অথচ, ও যে, তোমার আমার মতো স্ত্রীর স্বামী, ছেলের বাপ, এগুলো কোন পরিচয় নয়। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করবে, সেই পয়সায় নিজে খাবে, বৌ ছেলে খাওয়াবে পরাবে, সে সম্মানবোধ ওর মনে জাগবার কোনো সুবিধেই কেউ দেবে না। আমি বলি, এ বিচার নয়, এ অত্যাচার।

বলে দম নেন নিভাননী। হৃষীকেশ সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। মাকে এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলতে কখনো শোনেনি কনখল। যেন নতুন চোখে দেখে তাঁকে, সম্ভ্রমে বুক ভরে ওঠে।

হৃষীকেশ বোঝেন, হাসিঠাট্টার ফোড়ন কেটে এ প্রসঙ্গে দাঁড়ি টানা যাবে না। আর

তাঁর নিজের মনোভাব মনে পড়ে, একদিন হরেনের সাথে কথা কাটাকাটি করতে গিয়ে তিনিও প্রায় একই কথা বলেছিলেন।

কিন্তু বাইরে বাইরে আস্তাবলের কাজ, আর বাড়ীতে রাত পাহারার কাজ, দায়িত্বের তারতম্য যে অনেক। নিভাননীর দুঃখ মুখের দিকে তাকিয়ে শক্তি সংগ্রহ করেন। অস্থির নদীতে দুদাঁড়ের নৌকোর বইঠার মাঝি যেমন করে তাকায় হালের মাঝির দিকে। সুনির্ভরে দায়িত্ব ভাগাভাগি করবার ভরসা খোঁজেন যেন জীবনসঙ্গিনীর কাছে। বোধকরি পেয়ে যান, আশ্বস্তি আসে মনে।

বলেন কিন্তু চঞ্চল সুরে,—গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। নন্দলাল বহাল। বাঁচলুম বাবা মাথা ঘামানো থেকে। তবে হরেনের দল বাক্যবাণ বর্ষণ করতে ছাড়বে না, বলে রাখছি।

—করুক। খুব ত বন্ধু হয়েছেন তোমার, এবারে আমার সাথে আলাপ করিয়ে দাও, আমি জবাব দেব।

—আর বিদ্যাভূষণ যখন প্রাকৃতে অপ্রাকৃতে নানাবিধ আর্ষবাক্য ছাড়বেন?

—তাঁকে ত গুরুজন বলে মানি, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করি। দরকার হলে তাঁর সাথেও তর্ক করতে ছাড়ব না।

—না না, তিনি বোম্বা লোক—পণ্ডিত। বাজে তর্ক করেনই না।

নিজের ঘরে ফিরে আসে যেন রাজ্য জয় করে কনখল। তেমনি গর্ববোধ করে। বুদ্ধিটা ত তার মাথায়ই এসেছে। এখন ব্যাঙাটাকে ইস্কুলে দিতে রাজী করাতে হবে মাকে। একটার পর একটা—এখুনি নয়। ছোট্ট মাথাটিতে অনায়াসে চাণক্যনীতি খেলে। বেশ ভারিক্কি চালে বসে এসে পড়ার টেবিলে। একটি সাফল্যের সাথে যেন আত্মশক্তিতে বিশ্বাস ফিরে আসে কনখলের। খানিক আগের না পারা আধকষা আঁকটা হাত দিতে না দিতে হয়ে যায়। উত্তরমালা খুলে দেখে ঠিক্ মিলে গেছে। তৃপ্তির সাথে সাথে একটা অবজ্ঞার ভাবও জাগে। ভারী ত অঙ্ক!

[ক্রমশঃ]

নৈরাজ্যবাদ : বিপ্লবযুগ

অতীন্দ্রনাথ বসু

৯। রুশ : নিহিলিজম্

উনিশ শতকের মাঝামাঝি জার্মান পর্যটক ব্যারন ফন হক্সথেউসেন রুশে এসে আবিষ্কার করলেন এক সামুদায়িক ভূমি ব্যবস্থা। তিনি দেখলেন এখানকার গ্রামগুলি এক একটি চাষী-কমিউন, যাকে তারা বলে 'মির'। এর মাথায় আছে একজন প্রধান, গৃহকর্তাদের সঙ্গে বসে সে গ্রামকৃত্য নির্বাহ করে। সভায় স্থির হয় জমিতে এবার কোন কোন ফসল তোলা হবে, আর জমির উর্বরতা রক্ষার জন্যে ফসলের আবর্তন হবে কি প্রকারে। যখন কোন কোন পরিবার আয়তনে বেড়েছে, কোন কোন পরিবার কমেছে তখন সকলের মধ্যে সমতা রাখবার জন্যে নতুন করে জমির ভাগ বাটোয়ারা হয়। অবশ্য চাষীরা তখন ভূমিদাস এবং মালিকের অধিকার ছিল বাটোয়ারা রদবদল কারবার।

চাষীরা যে নির্বিবাদে মালিকের অধিকার মেনে নিত, অথবা মালিক যে সর্বদা নিজ অধিকার খাটাতে পারত তা নয়। ভূমিদাস চাষীদের দাবি ছিল—"আমরা তোমার সম্পত্তি বটে কিন্তু জমি আমাদের সম্পত্তি।"

কমিউনে ছিল তিন প্রকারের জমি ও স্বত্ব। বাস্তুভিটা ও বাগান ছিল চাষীর। মাঠ, গোচর ও জঙ্গল ছিল গ্রামের। খেতখামারগুলিতে স্বত্ব ছিল যৌথ কিন্তু আবাদ হত পৃথক। এর ভাগ বিলি করত কমিউন। এ প্রথা ক্রমশ লোপ পেয়ে যাচ্ছিল এবং বহু জায়গায় জোতগুলি চাষীর দখলে চলে এসেছিল।

জমি বিলি করা ও চাষের তদারক করা ছাড়া কমিউনের আরও কাজ ছিল। মির ছিল গ্রামীণ স্বায়ত্ত শাসনের পীঠ। রাস্তাঘাট, সাঁকো ইত্যাদি মেরামত করবার কাজ ভাগ করে দেওয়া, অকালের জন্যে খাদ্যশস্য মজুত রাখা, যৌথভূমির তত্ত্বাবধান করা, অগ্নিকাণ্ড ও চুরি-ডাকাতির বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা, ঝগড়াঝাটির সালিশি, এমন কি বিবাহ-বিচ্ছেদের হুকুম দেওয়া—এসব ছিল মিরের এখ্তিয়ারে।

আদিম যূথ সমাজের সার্বজনীন ধারা বহন করে আসছিল রুশের এই গ্রামগোষ্ঠী। ব্যারনের নিজের দেশে তখন ধ্বংসাত্মক চিন্তাভাবনার ধাক্কা এসেছে,—তিনি বিদেশের গ্রামে প্রাচীন ঐতিহ্যের একটা আশ্রয় খুঁজে পেলেন। কিন্তু রুশের প্রগতিবাদীরা এর মধ্যেই পেল নূতন সমাজের ইঙ্গিত। আলেকজাণ্ডার হারৎজেন দেখতে পেলেন এক নবীন রুশের চিত্র, যেখানে মির ও মুজিকের বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠেছে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজতন্ত্র, তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে কারিগরদের সমবায় সমিতি বা আর্তেল। মুক্ত কমিউনগুলির সম্মিলনে তৈরী হবে নবীন রুশ। "বিপ্লবী ভাবনার ইতিহাস" নামক গ্রন্থে তিনি দেখালেন যে এই বিকেন্দ্রিত সমাজতন্ত্রের ভিত্তি তৈরী হয়েই আছে। জাতির প্রাণশক্তি নিহিত মির এবং আর্তেলে—রোমানভ্ সম্রাটরা তার ওপর চাপিয়েছে ভূমিদাসত্ব, অভিজাত ও আমলাতন্ত্রের অবান্তর বোঝা। এর ওপর এসে জুটেছে গ্রীক চার্চ। এই রক্তশোষা পরগাছাগুলিকে সমূলে উৎপাটন করতে হবে, কিন্তু জোরজবরদস্তি করে নয়। জনতার মনে সাড়া তুলতে হবে। তারা সচেতন না হলে বিপ্লব অসম্ভব। ইয়োরোপে নির্বাসনে বসে হারৎজেন

"কলকল" বা "ঘণ্টা" নাম দিয়ে এক পত্রিকা বার করলেন। সীমান্তের বেড়া ডিঙিয়ে রুশের ঘরে ঘরে এই পত্রিকা তাঁর আদর্শ প্রচার করতে লাগল।

হারৎজেনের সমসময়ে শতকের ষষ্ঠ দশকে নিকলাস চের্নিশেভস্কি তাঁর "সমকালীন" পত্রিকার মাধ্যমে একই প্রকার আদর্শ ছড়াতে লাগলেন। তিনিও পেলেন চাষীর মির ও কারিগরের আর্তেল সমাজতন্ত্রের বীজ। রুশ সরাসরি সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তীর্ণ হবে, ইয়োরোপের মত তাকে ধনতন্ত্রের দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যেতে হবে না। জারের শাসনে বসে এসব কথা বলার যা পরিণাম চের্নিশেভ্স্কির কপালে তাই জুটল। জেলখানায় বসে তিনি একটা উপন্যাস লিখলেন—"কি করতে হবে?" তাতে আঁকলেন তাঁর স্বপ্ন মুক্ত কমিউনের ছবি।

এদিকে তখন রুশ তরুণদের বুকে বারুদ জমছে। তারা চায় সর্বাঙ্গীন মুক্তি, সকলের আগে বুদ্ধির মুক্তি। বুদ্ধির ওপর কোন শাসন নেই। সভ্যসমাজ মিথ্যাচারের নাগপাশে ব্যক্তিকে আপাদমস্তক আবদ্ধ করেছে, ছিঁড়তে হবে সে বন্ধন। এই গোষ্ঠীর একজন উত্তর-সাধকের কথায়

> এই বিদ্রোহের মূলকথা সমাজ, পরিবার ও ধর্ম ব্যক্তির উপর যত বাধকতা আরোপ করিয়াছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা।[১]

ইয়োরোপে ফরাসী বিপ্লবের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়েছে, গণতন্ত্রের স্বপ্ন বিলীয়মান। স্বৈরাচারী জারের শাসনে মুক্তিপিপাসু তরুণ নির্বিচার নেতিবাদ ভিন্ন আর কোন রাস্তা দেখতে পেল না।

টুর্গেনিভ তাঁর "পিতা ও পুত্র" উপন্যাসে (১৮৬২) এই দৃষ্টিভঙ্গির নামকরণ করলেন নিহিলিজম বা শূন্যবাদ।[২] উপন্যাসের নায়ক বাজারভ খাঁটি মুক্তবুদ্ধি অবিশ্বাসী। তার চেলা আর্কেডির কথায় নিহিলিস্ট হল এমন ব্যক্তি যে কোন কর্তার কাছে মাথা নোয়ায় না, কোন নীতিকে অন্ধ বিশ্বাসে গ্রহণ করে না—সে নীতি যত পবিত্রই হোক না কেন। তার একনিষ্ঠ আনুগত্য বিচারবুদ্ধির প্রতি। সে মুখপোড়া, স্পষ্টবাদী, রেখে ঢেকে কথা কয় না। বিবাহ, প্রেম, বন্ধুতা তার কাছে ভুয়া। বাজারভ বলছে, "যদি কোন নারীকে তোমার ভাল লেগে যায়, তবে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা কর। কিন্তু যদি বিফল হও, বেশ ত—ছেড়ে দাও তাকে, সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে ভাল মাছ আছে।" আদব কায়দা, ভদ্রতা, আবেগ, উচ্ছ্বাস এসব তার উপহাসের বস্তু। তার একাগ্র নিষ্ঠা বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানের তত্ত্বকথায় নয়, ব্যবহারিক প্রয়োগে।

এই দলের চিন্তানায়ক ছিলেন দ্মিত্রি পিসারেভ,[৩] "রুশ্‌কোয়ে শ্লোভো" বা "রুশের কথা" পত্রিকার নিয়মিত লেখক। টুর্গেনিভের চিত্রিত নিহিলিস্ট চরিত্রকে তিনি সাদরে স্বীকৃতি দিলেন। নিহিলিস্ট খাপছাড়া—চলতি দুনিয়ার সঙ্গে সে তাল রেখে চলে না। পিসারেভ চারদিকে তার বাক্যবান বর্ষণ করতে লাগলেন। দর্শন, ধর্ম, সভ্যতা, নীতিশাস্ত্র,—শেষে বিজ্ঞান, শিক্ষা, চারুকলা কিছু বাদ রইল না। শিক্ষা ব্যক্তিত্বের ওপর জুলুমবাজি আর চারুকলা রূপের ব্যবসা।

---

১ স্টেপনিয়াক : আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা, লণ্ডন, ১৮৮০, ৪ পৃষ্ঠা।

২ 'নিহিল' অর্থ 'কিছু না'।

৩ পিসারেভের লেখার সংকলন করেছেন এ. ককার : দ্মিত্রি পিসারেভ এ. লিদেঅলজি দ্যু নিহিলিজ্‌ম রুশ, পারি, ১৯৪৬।

> র‍্যাফেলের চেয়ে একজন মুচির কদর বেশি; কারণ মুচির হাতে কাজের জিনিস তৈরী হয়, আর র‍্যাফেল যা তৈয়ার করেন তাহা কোন কাজে লাগে না।

এই আত্মসর্বস্ব কাজের লোকেরা যদি নিজ নিজ ভবিষ্যত গুছিয়ে নিয়ে ভড্‌কার টেবিলে বসে সমালোচনার তুবড়ি ছোটাত তাহলে সেটা মানাত ভাল। কিন্তু তা হল না। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ফলিত দর্শন নিয়ে তারা যেমন মাতামাতি শুরু করল তা গোঁড়া ধর্মান্ধদের হার মানায়। বুয়েক্‌নারের 'স্টফ আণ্ড ফ্রাফ্‌ট্‌' বা 'শক্তি ও পদার্থ' হল তাদের বেদ। একজনের স্বীকারোক্তি : 'আমরা প্রত্যেকে মলেশ' ও ডারউইনের জন্যে হাড়িকাঠে মাথা পেতে দিতে প্রস্তুত ছিলাম।' এই প্রকারে বস্তুর ওপর এসে দাঁড়াল বস্তুবাদ, বিচারবুদ্ধির সঙ্গে মিশল বিশ্বাসের সংস্কার। নাস্তিকদের পাল্টা চার্চ তৈরী হল, আস্তিকরা হল মহাপাতক।

পিসারেভ বললেন বাসনা চরিতার্থ করা মানে ইন্দ্রিয় সেবা নয়। খাঁটি বাস্তববাদী জানে যে তার গুণপনা সমাজের জিনিস, সে নির্বোধ ভোগবিলাসে তা ক্ষয় করে না। তোমার মনের ঠিক ঠিক তৃপ্তি হবে তখন 'যখন বুঝতে পারবে যে তুমি মানুষের কোন কাজে লেগেছ, তোমার সঞ্চিত ঋণের বোঝা থেকে কিছু কিছু তুমি শোধ করছ।' এই প্রকারে যুক্তিশীল নেতিবাদকে ছাপিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল সামাজিক ন্যায়ের আদর্শ—

> অন্নহীন ও বস্ত্রহীনের অনিবার্য সমস্যার স্থায়ী সমাধান—এই প্রশ্নের বাহিরে কোন কিছু নাই যাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার অথবা হৈ-চৈ করিবার কোন সার্থকতা আছে।

কাব্য ও কলা, বিজ্ঞান ও দর্শন হবে সমাজনিষ্ঠ, এদের ওজন হবে সমাজের মানদণ্ডে। সামাজিক প্রশ্নের জবাব যাতে নেই তার থাকবার অধিকার নেই। বর্তমান সমাজকে নির্মমভাবে নাশ করতে হবে, তবেই আসবে নূতন সমাজ, নূতন জীবনমূল্য নিয়ে। পিসারেভ লিখলেন

> যাহা চূর্ণ হইবার তাহা চূর্ণ করিয়া দাও। যাহা আঘাত সামলাইয়া উঠিতে পারিবে তাহা টিকিয়া থাকিবার যোগ্য, যাহা টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে তাহা জীর্ণ। যাহাই হউক, ডাইনে বামে আঘাত হানো—তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, হইতে পারে না।

নেতিবাদ ও নাশকতার দার্শনিক বিস্তারে যদি এরা ক্ষান্ত হত তাতে রুশের কারও নিদ্রাভঙ্গ হত না। পিসারেভ যখন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন তখন জারের টনক নড়ল।

> যুক্তির আঘাতে স্থবির স্বেচ্ছাচার, জরাজীর্ণ ধর্ম এবং সরকারী নীতিশাস্ত্রের ঘুনধরা তক্‌তাগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,...রোমানভ বংশ ও সেণ্ট পিটার্সবার্গের আমলাবর্গ নিপাত হউক...যাহা ক্ষয়িষ্ণু আপনা হইতে তাহা কবরে গিয়া পড়িবে। আমাদের কাজ শুধু শেষ ধাক্কাটা দেওয়া এবং উহাদের পূতিগন্ধ শবদেহের উপর ধূলি বর্ষণ করা।

স্বেচ্ছাচারী সরকারকে লক্ষ্য করে পিসারেভ লিখলেন তার হাতে আছে প্রচারের যন্ত্র ও পশুবল। এর সঙ্গে যখন খোলাখুলি পাল্লা দেবার উপায় নেই, তখন জনতাকে গোপন প্রচারের আশ্রয় নিতে হবে।

এর পর জারের পুলিস চুপ করে থাকতে পারে না। প্রচারপুস্তিকাটি বাজেয়াপ্ত করে রচয়িতাকে তারা পিটার এণ্ড পল দুর্গে পাঠিয়ে দিল। ১৮৬২ সালের জুলাই থেকে ১৮৬৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চার বছর জেলে কাটল। তাঁর অধিকাংশ রচনা এই

সময়কার। মুক্তির পর দুই বৎসরের মধ্যে ল্যাটভিয়ার উপকূলে স্নান করতে গিয়ে তিনি জলমগ্ন হন। তখন তাঁর বয়স সাতাশ বছর। এর মধ্যেই রুশ তরুণের বুকে তিনি আগুন ছুঁইয়ে গেলেন।

আত্মপর যুক্তিসর্বস্ব নিহিলিস্ট দর্শন থেকে উৎপন্ন হওয়া উচিত ছিল তার্কিক ভোগবাদী, আসলে উৎপন্ন হল কঠোর বৈরাগী—যার কাছে কেবল ধনসম্পদ নয়, শিল্পকলা, দর্শন ও আধ্যাত্মতত্ত্বও পঙ্কিল বিলাসিতা। নিহিলিস্ট শুরুতে ছিল মুক্তবুদ্ধি সংশয়ী, আখেরে হল আত্মত্যাগী সমাজবাদী। নীতিশাস্ত্রকে নস্যাৎ করে সে এমন এক কৃচ্ছ্রসাধনায় মগ্ন হল যার তুলনা পাওয়া কঠিন। খাঁটি নিহিলিস্টের কাছে আপন মুক্তি ও সুখ সকলের উপরে—সে নিষ্প্রেম, নির্বিবেক, বেপরোয়া। যখন নিজের মুক্তি ও সুখ বিসর্জন দিয়ে সে সমাজের মুক্তি ও সুখের জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হল, তখন স্বধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে হল সমাজবিপ্লবী।

১৮৬২ সালে 'জমি ও মুক্তি' নামে এক বিপ্লবী সমিতি গঠিত হল। ১৮৬৬ সালে কারাকাজভ নামে একটি যুবক জারকে হত্যা করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। পুলিসের তৎপরতার বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হল। এদের মধ্যে একজন, পিটার লাভরভ (১৮২৩-১৯০০) নির্বাসনে বসে লিখলেন "ঐতিহাসিক পত্রাবলী" (১৮৬৮-৬৯)। পরের বছর সুইৎজারল্যান্ডে পালিয়ে এসে তিনি "ভ্পিরিওদ" বা "অগ্রগামী" নামে এক পত্রিকা বের করলেন। শিক্ষিত তরুণদের তিনি দেখালেন গ্রামের রাস্তা, ঘুমন্ত মুজিকদের জাগিয়ে তুলবার কাজ তাদের। যাদের আছে ভাববার, বিচার করবার শক্তি সমাজের উন্নতি সাধনের দায় তাদের হাতে। সকলের আগে চাই নিজের সর্ববিধ শক্তির অনুশীলন, তারপর চাই সেই শক্তির প্রয়োগে সামাজিক বিধানে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। নূতন বিধান রচিত হবে সাম্য ও স্বাধিকারের মূল মির ও আর্তেলের উপর। আশাহত গ্রাম্য জনতার দুয়ারে দুয়ারে এই বাণী পৌঁছে দিতে হবে, তাদের মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা দিতে হবে।

এর পর 'জনতার সংকল্প' নামে গঠিত হল উগ্র বিপ্লবী দল। তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে লাভরভ যে বিপ্লবের দিগ্‌দর্শন দিলেন সে ষড়যন্ত্র ও সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথ নয়। বিদ্রোহের আগে চাই প্রস্তুতি প্রচার—সর্বসাধারণের মনে ব্যাপক অসন্তোষ ও নূতন সমাজব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা। গণচেতনা জাগ্রত হলে রাষ্ট্রশাসনের ইমারত আপনিই ধ্বসে পড়বে, স্বাধীন চুক্তি ও আদান প্রদানের মাধ্যমে মানুষ আপনার ভাগ্য রচনা করবে।

এদিকে পশ্চিম ইয়োরোপ থেকে রাশি রাশি সমাজবাদী ও নৈরাজ্যবাদী সাহিত্য সীমান্ত-প্রহরা ভেদ করে রুশের ভেতর ছড়িয়ে পড়ছিল। বিপ্লবী ভাবনার রস পেয়ে রুশের ঊষর মাটিতে জাগল সৃষ্টি-সম্ভাবনা। পিতৃপুরুষের শোষণলব্ধ বিত্ত পরিত্যাগ করে তরুণতরুণীরা হল পথচারী—স্বদেশতীর্থের সন্ধানে তারা গ্রাম-গ্রামান্তরে চলে গেল ডাক্তার শিক্ষক ধাত্রী সেবিকা এমন কি চাষী কারিগর হয়ে—গ্রামবাসীর কানে প্রচার করতে লাগল বিপ্লবের মন্ত্র। নগরে নগরে লোকচক্ষুর আড়ালে জমল গুপ্ত সমিতি। ১৮৬৬ সালের ১৫ই এপ্রিল জারের ওপর কারাকাজভের হামলা ব্যর্থ হল। পরবর্তী মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে দেখা গেল কারাকাজভ ও তার সহকর্মীরা সব ধনকুবেরদের সন্তান। সব ছেড়ে এসে তারা হয়েছিল শ্রমজীবী। তারা এক এক ঘরে তিন চারজন করে বাস করত, মাথাপিছু

মাসে খরচ করত দশ রুবল (১৫৲ টাকার মত), বাকি আয় ঢেলে দিত নিজেদের সমবায়ী কারখানায় বা সমিতিতে।

সার্গিয়েই নেচাএভ নামে একটি ভূমিদাসের ছেলে সেণ্ট পিটার্সবার্গের কলেজে পড়তে এসে কারাকাজভের দলে যোগ দেয়। হত্যা ও নাশ ছাড়া আর কিছু সে বুঝত না। তার গরম গরম কথা পুলিসের কানে পৌঁছতে বিলম্ব হল না। গ্রেপ্তার আসন্ন বুঝে নেচাএভ স্থির করল দেশ ছেড়ে পালাবে। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে যাবে বীরপুরুষের গৌরব। সেণ্ট পিটার্সবার্গের স্তাবকদের উদ্দেশে* সে একটি চিঠি লিখল যে জারের পুলিস তাকে গ্রেপ্তার করে এক অজানা দুর্গে নিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে সে আর একটি পত্র জুড়ে দিল সেটি যেন একজন অজ্ঞাতনামা ছাত্রের লেখা,—একটি পুলিসের গাড়ি থেকে একজন কয়েদী প্রথম পত্রটি ফেলে দিয়েছে, সেইটি কুড়িয়ে নিয়ে সে নির্দিষ্ট ঠিকানায় পাঠাচ্ছে। চিঠি পেয়ে ইউনিভার্সিটির ছেলেরা যখন তার মুক্তির দাবিতে হৈ-চৈ করছে তখন নেচাএভ একটি জাল পাসপোর্ট নিয়ে সীমান্ত পার হয়ে সুইৎজারল্যান্ডের দিকে পা বাড়াল।

জেনেভায় এসে সে তার মানসপিতা বাকুনিনের সঙ্গে সাক্ষাত করল এবং বিপ্লবী ভোলানাথকে কয়েকটি রূপকথার গল্প শুনিয়ে মুগ্ধ করল। সারা রুশসাম্রাজ্যব্যাপী বিপ্লবের আয়োজন করেছে রুশের কমিটি অব একশন, তারই প্রতিনিধি হয়ে সে আসছে পিটার এণ্ড পল দুর্গ থেকে পালিয়ে। এতদিনে মনের মতন 'ছেলে' পেলেন বাকুনিন, তৎক্ষণাৎ 'রুশ কমিটি অব একশনের' প্রতিনিধিকে সনদ দিলেন 'বিশ্ববিপ্লবী সংস্থার রুশ শাখার' প্রতিনিধিত্ব করবার। বুদ্ধিমান পুত্র এই ছাড়পত্রের চেয়ে মূল্যবান একটি জিনিস যোগাড় করে নিল। বাকুনিনের মধ্যস্থতায় এক ধনী বন্ধুর কাছ থেকে সে দশ হাজার ফ্রাঁক হস্তগত করল, অবশ্য আশ্বাস দিতে ভুলল না যে এ টাকায় ঠিক ১৮৭০ সালের উনিশে ফেব্রুয়ারী সারা রুশে বিপ্লবের আগুন জ্বলবে।

দলের আদর্শ ও কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ হল তিনটি পুস্তিকায়—"বিপ্লবের প্রশ্ন কি আকারে আসিয়াছে", "বিপ্লবের নীতি" এবং "বিপ্লবের বিতর্কিকা"।* প্রথমটি রুশ চাষীর বন্দনা ও তার নাশাত্মক ঐতিহ্যের প্রতি আবেদন। দ্বিতীয়টি নাশাত্মক উপায়ের বর্ণনা—'বিষ, ছুরি, দড়ি ইত্যাদি।' তৃতীয়টিতে আছে ষড়যন্ত্র ও নাশকতার বিশদ ব্যাখ্যান এবং বিপ্লবী চরিত্রের মান নির্ধারণ।

> ১। বিপ্লবীর আপনার বলিতে কিছুই নাই—না কোন ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, আকর্ষণ, বিত্ত, এমন কি নাম। তাহার সর্বস্ব ডুবিয়া গিয়াছে এক স্বার্থে, এক চিন্তায়, এক নেশায়—বিপ্লবে।...
>
> ৩। একটি মাত্র বিজ্ঞান তাহার জানা আছে—ধ্বংসের বিজ্ঞান। শুধু এই উদ্দেশ্যে সে বলবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও সম্ভব হইলে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে।...
>
> ৪। ... তাহার ন্যায় অন্যায়ের বালাই নাই। যাহা বিপ্লবের জয়লাভে সহায়ক তাহা ন্যায়সঙ্গত, আর যাহা তার প্রতিবন্ধক তাহা অন্যায় ও অপরাধ।...

* চিঠিটা লেখা হয় স্বনামধন্যা বিপ্লবী মেয়ে ভেরা জাসুলিচকে।

* এই পুস্তিকাগুলিতে বাকুনিনের দান কতখানি তা নির্ণয় করা কঠিন। বাকুনিন নেচাএভের মত হৃদয়হীন ছিলেন না এ নিঃসন্দেহ। কোথাও কোথাও বাকুনিনের চিন্তার ছাপ সুস্পষ্ট, যেমন "বিতর্কিকা"র শেষ চার অনুচ্ছেদ (২৩-২৬) যেখানে রাষ্ট্র, সম্পত্তি, অভিজাত, আমলাতন্ত্র ও পাদরিদের মুণ্ডপাত এবং দস্যুবৃত্তির প্রশস্তি পাঠ হয়েছে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে।

৬। নিজের উপর সে যেমন কঠিন অন্যের প্রতিও তাহাকে তেমন কঠিন হইতে হইবে। তাহার হৃদয়ে আত্মীয়তা, বন্ধুতা, প্রেম, কৃতজ্ঞতা ইত্যাদি কোমল অনুভূতির স্থান নাই, বুক জুড়িয়া আছে বিপ্লবী সাধনার কঠোর আবেগ। তাহার তৃপ্তি, সান্ত্বনা ও আনন্দ কেবল বিপ্লবের সফলতায়। অহোরাত্র তাহার এক ধ্যান এক জ্ঞান,—নির্মম সংহার।...

৮। বিপ্লবীর বন্ধুতা ও আকর্ষণ থাকিবে শুধু তাহাদের প্রতি যাহারা কাজের মধ্য দিয়া তাহার মত বিপ্লবী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সাথীর প্রতি তাহার বন্ধুতা, অনুরাগ ও দায়িত্ব নিরূপিত হইবে সর্বধ্বংসী বিপ্লবে সাথী কতটা কার্যকরী তাহা দিয়া।

পরবর্তী কয়েকটি ধারায় সমাজের উপরতলার লোকদের ছয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বিপ্লবের কাজে সবচেয়ে অনিষ্টকর লোকগুলি প্রথম পর্যায়ভুক্ত। তাদের অবিলম্বে শেষ করে দিতে হবে।

১৬। লোকটা কত বদমাস কিংবা দল অথবা জনসাধারণ তাহাকে কত ঘৃণা করে এই মাপকাঠিতে তালিকা তৈয়ারী হইবে না। জনতাকে ক্ষেপাইয়া তুলিবার পক্ষে বরং এই বদমাসি ও ঘৃণা কাজে লাগিতেও পারে।...

১৭। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকিবে এমন সব লোক যাহাদিগকে আপাতত হত্যা করা হইবে না যাহাতে তাহারা পাশবিক অত্যাচারে জনতাকে অনিবার্য বিদ্রোহের পথে ঠেলিয়ে দিতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে 'উচ্চপদস্থ পশুর দল'। তাদের ফাঁদে ফেলে কাজে লাগাতে হবে। চতুর্থ পর্যায়ে থাকবে উচ্চাভিলাষী উদারপন্থীরা। তাদের কার্যক্রম গ্রহণ করবার ভান করে তাদের গোপন অভিসন্ধি ধরতে হবে—তারপর হাতের মুঠোয় এনে তাদের খেলাতে হবে। পঞ্চম পর্যায়ে থাকবে বাক্যবিলাসীরা। তাদের খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গরম গরম বিবৃতি দেওয়াতে হবে যাতে তারা ধরা পড়ে জেলে যায় এবং তাদের সমালোচনা থেকে অব্যাহতি পেয়ে অল্প-সংখ্যক খাঁটি বিপ্লবী তৈরী হতে পারে। ষষ্ঠ পর্যায়ে থাকবে মেয়েরা। তাদের মধ্যে যারা স্বার্থপর ও ছিদ্রান্বেষী তাদের প্রতি ঐ প্রকৃতির পুরুষদের মত আচরণ করা হবে আর যারা খাঁটি 'তারা আমাদের অমূল্য রত্ন'।

২২। জাতির উপর দিয়া যত প্রকার উৎপীড়ন ও দুর্যোগ চলিতেছে দলের কাজ হইবে সকল উপায়ে সকল শক্তি দিয়া সেগুলিকে বাড়াইয়া তোলা যাহাতে অবশেষে জনতা ধৈর্য হারাইয়া ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থানে নামিয়া পড়িতে বাধ্য হয়।[৬]

নীতি, কৌশল ও কার্যপদ্ধতি সকলই অভূতপূর্ব। তার চেয়েও প্রধান বৈশিষ্ট্য এর হৃদয়হীনতা। এতদিন বিপ্লবী শত্রুকে আঘাত করেছে জনসমাজের শুভার্থে। ঘর ও সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে যারা এই দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে ভ্রাতৃসম্বন্ধ, পরস্পরকে ভালবেসে তারা শূন্য মণিকোঠা পূরণ করেছে। এবার বিপ্লবের পাষাণদেবতা চলে গেল ভালবাসার ঊর্ধ্বে, যাদের জন্যে বিপ্লব এবং যাদের নিয়ে বিপ্লব তাদের উপরে;—হিংসা আর প্রতারণার কোন সীমা রইল। নেচাএভের মৌলিকতা এইখানে। একমাত্র সেই নিহিলিজম্-এর শূন্যবাদকে রাষ্ট্রবিপ্লবে প্রবর্তন করতে পেরেছিল,—যে বিপ্লব নীতিহীন,

[৬] ম্যাক্স্ নোমাড : এপস্লস্ অব দি রিভলুশন, বস্টন, ১৯৩৯, ২২৮ ও পরবর্তী পৃষ্ঠা।

নির্বিবেক, নির্মম, যাতে কোন সাংগঠনিক উদ্যোগের নামগন্ধ নেই।

এই দর্শন আর তার সঙ্গে বাকুনিনের ছাড়পত্র ও টাকা নিয়ে নেচাএভ রুশে ফিরে এল। 'জনতার প্রতিহিংসা' কমিটি নাম দিয়ে সে এক দল গড়ল, এর প্রতীক হল কুঠার। এক একজন নায়কের পরিচালনায় পাঁচ পাঁচজনের গ্রুপে দলটা ভাগ করে দেওয়া হল যাতে এক গ্রুপের কথা অন্য গ্রুপ না জানতে পারে। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে সব খবর আসত এবং তার নির্দেশ সকল গ্রুপকে নির্বাচারে মানতে হত। কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে দলের যোগসূত্র ছিল একা নেচাএভ। অনুচরদের হাতে রাখবার জন্যে নেতাদের হিংসা ও প্রতারণার আশ্রয় নেবার অধিকার ছিল। দলে লোক আনবার জন্যে সাহস ও বলিদানের প্রেরণায় আবেদন করা হত না। বিশ্বাসীদের ভাঁওতা দিয়ে, অবিশ্বাসীদের ভয় দেখিয়ে, আবেগ-প্রবণদের রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়ে দলে ভেড়ান হত। পরিচিত লোকদের কাছে তাদেরকে জড়িয়ে এমন সব চিঠিপত্র পাঠান হত যাতে তারা পুলিসের খপ্পরে পড়ে এবং গুপ্ত ষড়যন্ত্রে নামতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী আমলাদের প্রশ্রয় দেওয়া ছিল দলের নীতি, কারণ জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলতে হলে উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়ে যেতে হবে। কাজেই দুর্বৃত্ত সরকারী কর্ম-চারীদের হত্যা করা ছিল নীতিবিরুদ্ধ।

দলের ছেলেদের নিয়ে এই ধমক ও ধাপ্পাবাজির খেলা বেশী দিন চলল না। ইভানভ নামে কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ছেলে ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের জন্যে সস্তাদরে একটা হোটেল চালাত। নেচাএভের হুকুম হল এর দেয়ালে একটি বিপ্লবী প্রচারপত্র এঁটে দেবার। ইভানভের মনে নেতার ওপর সন্দেহ জাগছিল। অধিকন্তু হোটেলের ওপর পোস্টার আঁটলে পুলিস ওটা ভেঙে দেবে এবং গরীব ছেলেরা খুব অসুবিধায় পড়বে। দলের নীতি অবশ্য তাই চায়—যত অত্যাচার বাড়বে তত ভাল জমি তৈরী হবে। কিন্তু ইভানভ তার আদর্শপ্রবণ ও সেবাপরায়ণ মন নিয়ে তা বুঝতে চাইল না—নেচাএভের নির্দেশ সে অমান্য করল। পুলিসের কাছে সে সব কথা ফাঁস করে দিতে পারে এই আশঙ্কায় তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল। নেচাএভ ও কেন্দ্রীয় গ্রুপের আর তিনজন তাকে এক বাগানে নিয়ে গিয়ে গুলি করল। হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত এই গ্রুপের ছেলে উসপেন্স্কি প্রশ্ন করেছিল,—একটি দুরাচার অফিসারকেও যে দণ্ড দেওয়া হয় নি, ইভানভের মত একজন আত্মনিবেদিত নিষ্ঠাবান কর্মীকে সেই দণ্ড দেওয়া হল এ কি রকম বিচার? নেচাএভ তাকে বুঝিয়েছিল 'এটা ন্যায় বিচারের প্রশ্ন নয়, কর্তব্যের প্রশ্ন। আমাদের লক্ষ্যের পথে যত কিছু বাধা তাহা সরাইয়া দিবার প্রশ্ন।' বিপ্লব কোন অধিকার দেয় না, দেয় শুধু দায়িত্ব, কর্তব্য—আর তা স্থির হয় ওপর থেকে।

এখন তোমাদের কাজ কথা বলা নয়, কাজ করিয়া যাওয়া, এবং এসব ব্যাপারে তোমাদের অপেক্ষা যাহারা যোগ্যতর লোক তাহাদের হুকুম মত কাজ করা। তোমাদের কর্তব্য তর্ক করা নয়, আদেশ পালন করা।[৭]

এদিকে পুলিসও তাদের কর্তব্য পালনে তৎপর হল। নেচাএভের দলের শত শত ছেলে গ্রেপ্তার হল। চুরাশিজনের কারাদণ্ড হল অল্পবিস্তর মিয়াদের। নেচাএভ আবার দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেল (১৮৭০) সুইৎজারল্যাণ্ডে। আবার সে বাকুনিনের কাছে এসে আর এক আজব গল্প ফাঁদল,—পুলিস যখন তাকে পাকড়াও করে সাইবেরিয়ায় নিয়ে যাচ্ছে তখন সাথীরা এসে তাকে ছিনিয়ে নেয় এবং সে রক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে এসেছে। বাকুনিন

[৭] ১৮৭১ জুলাই-এর মামলায় সাক্ষীর জবানবন্দী।

আবার তার কথায় বিশ্বাস করে তার কার্যকলাপে সাহায্য করতে লাগলেন। অবশেষে রুশ থেকে এসে উপস্থিত হল লোপাটিন নামে নেচাএভের এক পুরান সাথী। সারা রুশব্যাপী বিপ্লব ও দুই পলায়নের কাহিনী এবং ইভানভের আসল কথা সে ফাঁস করে দিল। বাকুনিন দেখলেন শিষ্য তাকেও খেলাচ্ছে। 'বিতর্কিকা'র উনিশ নম্বর ধারায় উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের গোপন তথ্য হস্তগত করে তাদেরকে হাতের মুঠোয় এনে খেলাবার যে কৌশল বাতলানো হয়েছে তার প্রয়োগ হচ্ছে গুরুর ওপর। এবার বাকুনিন নাচার হয়ে সহকর্মীদের কাছে মানসপুত্রের মুখোস খুলে দিলেন। একটি পত্রে তিনি লিখছেন—

> যদি তুমি তাহাকে তোমার বন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দাও তাহা হইলে তাহার প্রথম চেষ্টা হইবে তোমাদের মধ্যে বিভেদ কুৎসা ও চক্রান্ত সৃষ্টি করিয়া ঝগড়া বাধাইবার। যদি তোমার বন্ধুর স্ত্রী অথবা কন্যা থাকে তবে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে তাহাকে ফুসলাইয়া গর্ভবতী করিবার যাহাতে তাহাকে প্রচলিত নীতি-শাস্ত্রের খপ্পর হইতে ছিনাইয়া আনিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে নামানো যাইতে পারে।[৮]

বাকুনিনের খেয়াল ছিল না যে তাঁর নিজের যে সর্বনাশের ডাক তা থেকে প্রচলিত নীতি-শাস্ত্রও বাদ পড়ে না এবং শিষ্য তারই ব্যবহারিক প্রয়োগ করছিল মাত্র। তার দর্শনে বাকুনিনের মত অসঙ্গতি ছিল না—সে যা বুঝত তাই বলত এবং তাই করত। নিহিলিস্টদের মধ্যে যুক্তি ও বিশ্বাসের যে দ্বন্দ্ব ছিল সে তা কাটিয়ে উঠে নিহিলিজ্‌মকে যথার্থ শূন্যতায় পর্যবসিত করতে পেরেছিল।

নেচাএভ কাপুরুষ অথবা স্বার্থপর ছিল না। বাকুনিনের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার কিছু পরে সুইস সরকার তাকে রুশ সরকারের হাতে সমর্পণ করলেন (১৮৭২)। মস্কোতে যখন তার বিচার হয় তখন সে একটুও দুর্বলতার পরিচয় দেয় নি। কুড়ি বছরের সাজা নিয়ে সে গেল কুখ্যাত পিটার এণ্ড পল দুর্গে। সেখানকার একজন অফিসার তাকে সহকর্মীদের নাম ধাম বলে দেবার জন্যে প্রলোভন দেখালে তাকে সে ঘুসি মেরে ধরাশায়ী করে দেয়। ঐখানে বসে সিপাইদের নিয়ে সে দল তৈরি করল এবং বাইরে গুপ্ত সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল। দুর্গ থেকে তাকে বার করে নেবার একটা পরিকল্পনা দিয়ে সে 'জনতার সঙ্কল্প' দলের পরিচালকমণ্ডলীর কাছে এক চিঠি পাঠাল। এই দলের অন্যতম নায়িকা ভেরা ফিগ্‌নার পরে তাঁর স্মৃতিচারণে লিখছেন—

> সেই চিঠি আমাদের উপর এক অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিল। অকস্মাৎ যেন তাহার নামের উপর হইতে সকল কালিমা মুছিয়া গেল। নিরপরাধ লোকের রক্তপাত, জোর করিয়া টাকা আদায়, গোপন পত্র হাত করিয়া লোককে নাকে দড়ি দিয়া ঘোরানো, বিপ্লবের নামে যত রকম মিথ্যাচার ও অনাচারের জালপাতা,—সব আমরা এক নিমেষে ভুলিয়া গেলাম।
>
> আমরা দেখিলাম একটি মন যাহা বছরের পর বছর নির্জন কারাবাসে কাটাইয়া একটুও দুর্বল বা বিমর্ষ হয় নাই, একটি সংকল্প যাহা নিষ্ঠুর শাস্তির পেষণে মচকায় নাই, একটি তেজস্বী চরিত্র যাহা ব্যর্থতায় ম্রিয়মান হয় নাই। কমিটির বৈঠকে আমরা চিঠিটা পড়িলাম এবং এক চিন্তা সকলকে অধিকার করিল—তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে।[৯]

[৮] ই. এইচ. কার : মাইকেল বাকুনিন, লণ্ডন, ১৯৩৭; ৩৮৮ পৃষ্ঠা।

এক প্রচণ্ড ঘটনার আলোড়নে সমস্ত যোজনা ওলটপালট হয়ে গেল। তার ঝাপটা এসে পড়ল কারাগারেও। সেখানকার জেরা ও জুলুমের চাপে একজন কয়েদী নেচাএভের গোপন কথা ফাঁস করে দিল। সিপাইদের হল জেল। নেচাএভকে অন্য সকলের কাছ থেকে সরিয়ে এক অন্ধকার কুঠিরতে অর্ধভুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখা হল। কয়েকমাসের বেশি তাকে এ যন্ত্রণা ভুগতে হল না। ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে নির্জন কারাকক্ষে সকলের অলক্ষ্যে তার প্রাণবিয়োগ হল।

নেচাএভের কর্মজীবন চার বছরের, একুশ থেকে চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত। তারপর দশ বছর জেলের নিষ্ফল জীবন। যে পরিবেশে সে মানুষ তাতে সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করবার বয়স তার হয় নি। এনার্কিস্ট বলে আত্মপরিচয় দিলেও নৈরাজ্যবাদের কিছুই সে বুঝত না। নিহিলিজ্‌ম্‌-এর শূন্যতা, বাকুনিনের নাশকতা আর গোপন ষড়যন্ত্রের নেশা এই সব মিশিয়ে তৈরী হয়েছিল তার মানসিক ধাত। তার বিশেষত্ব এইটুকু যে বিপ্লব প্রচেষ্টাকে সে মানবত্ব থেকে সরিয়ে এনে একটা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পর্যবসিত করতে পেরেছিল। ধর্মীয় সংগ্রামে জেসুইটরা এবং রাষ্ট্রনীতিতে মেকিয়াভেলি যেমন ন্যায়-অন্যায়ের এক নূতন মাপকাঠি আবিষ্কার করেছিলেন, নেচাএভ বিপ্লব সাধনায় সেই কীর্তির অধিকারী। মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে সকল উপায়ই মঞ্জুর, এই আপ্তবাক্যকে একান্ত নিষ্ঠায় সে পালন করছে, যা বাকুনিনও পারেন নি। এর ফলে যে নৈরাজ্যবাদ ছিল মানবমূল্যে অধিষ্ঠিত এক পবিত্র আদর্শ তা হল কলঙ্কিত,—এনার্কিজ্‌ম্‌-এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল হিংসা ও প্রতারণার অপবাদ। অথচ আশ্চর্য কথা যে উত্তরকালে দুরুত্থান, সমকালে সহচরদের মধ্যেও তার বিপ্লবী নীতিশাস্ত্র বিশেষ আমল পায় নি। রুশের সে যুগের তরুণতরুণীরা তাদের রক্ত দিয়ে যে অবিস্মরণীয় মহাকাব্য লিখে গেছে তার মধ্যে নেচাএভ অধ্যায় একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্নের প্রলাপ।

রুশের ধনীর দুলালরা ঘর ছেড়েছিল মানুষকে ভালবেসে। হৃদয়বৃত্তির অপরিসীম উচ্ছ্বাস পরিবারের ছোট্ট আধারে তারা ধরে রাখতে পারে নি। তাদের বীজমন্ত্র ছিল 'ভ্‌নারদ',—জনতার সামিল হও। কারাকাজভ, শেকোভস্কি এরা গুপ্ত সমিতি গড়ে এই মন্ত্রে দীক্ষা নিল। সেণ্ট পিটার্সবার্গ ও মস্কো থেকে দলের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ল শহরে শহরে—কিয়েভ, ওডেসা, ওরেল, টেগেনরগ। ছেলেমেয়েরা গ্রামে গিয়ে বসল চাষী কারিগরদের কানে তাদের মন্ত্র পেঁছে দেবার জন্যে।

রুশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান খুব উঁচু ছিল না। সেখানে প্রগতিশীল জ্ঞানবিজ্ঞানের চিন্তাধারা ছিল নিষিদ্ধ। সুইৎজারল্যাণ্ডে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা ছিল খোলা। সেখানে রুশের ছাত্রছাত্রীরা যেত বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভের জন্যে। শুধু বিজ্ঞানের বই পড়ে তাদের খিদে মিটত না। তারা বসত শ্রমিক আন্তর্জাতিকের বৈঠকে, পড়ত প্রুদঁ, মার্ক্‌স্‌, বাকুনিন। খবর পেঁছিল জারের কানে। তিনি এক ফতোয়া জারি করলেন—এই মুহূর্তে সকল রুশ নাগরিক দেশে ফিরবে, অন্যথায় তারা দেশদ্রোহী বলে গণ্য হবে। কয়েক

[৯] বাকুনিনেরও এতটা মনের জোর ছিল না। তিনি দু বছর কারাবাসের পর 'জারের প্রতি স্বীকারোক্তি' করেছিলেন।

শ' ছেলেমেয়ে বুকে বারুদ নিয়ে দেশে ফিরল, এক কান থেকে আর এক কানে ছড়াতে লাগল তাদের মারাত্মক কথাবার্তা।

স্বৈরাচারী এমনি করেই নিজের ফাঁসিকাঠ তৈরি করে। গোয়েন্দা বিভাগ ঢেলে সাজা হল, তারা লাগল ছেলেমেয়েদের পিছনে। তিলমাত্র সন্দেহে তাদের গ্রেপ্তার করে সরকার দীর্ঘ মিয়াদের কারাদণ্ড দিল। আদালতের বিচার হয়ে দাঁড়াল তামাসা। সব সময়ে এ তামাসারও দরকার হত না। অনেকে চালান হত সোজা খানা থেকে অজ্ঞাতবাসে। এদিকে চাষীরাও সাড়া দিল না। তাদের জড়তা ছুটল না। একদিকে পুলিসের ভয়, অন্যদিকে 'বাবুদের কি জানি কি মতলব আছে সন্দেহ, তারা মনের দরজা খুলল না। সামনে তুষার-পর্বতের মত জনতা, পিছনে রুদ্রমূর্তি স্বৈরশাসন, মাঝে পড়ে বিপ্লবী পাতালের সুড়ঙ্গপথে অবতরণ করল।

এই পরিস্থিতিতে পুনরুজ্জীবিত হল ১৮৬২ সালের 'জমি ও মুক্তি' সমিতি। এর সুদক্ষ শিল্পী আলেকজাণ্ডার মিহাইলভ পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে সেণ্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো, ওডেসা, কিয়েভ ও খারকভের দলগুলিকে একত্রিত করল। গুপ্ত সমিতির লক্ষ্য হল জনতার হাতে জমি আর জনতার জীবনে মুক্তি। বিদ্রোহীদের দমন করতে শাসকশক্তির যেমন কোন মায়ামমতা নেই, শাসকদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় সমিতিরও তেমন কোন নৈতিক সংযম থাকবে না। চের্নিশেভ্স্কি ত' লিখেই গেছেন—

> ইতিহাসের রাস্তা গিয়াছে ধুলাকাদা, জলাভূমি ও ভাঙা ইটপাথরের উপর দিয়া। যাহার জুতা নোংরা হইবার ভয় আছে তাহার জনসাধারণের কাজে নামা উচিত নয়।

১৮৭৭ সালে দুটি বিরাট রাজনৈতিক মামলা রুজু হল,—একটি মস্কোতে পঞ্চাশজন আসামীকে নিয়ে, আর একটি সেণ্ট পিটার্সবার্গে একশ তিরানব্বই জনকে নিয়ে। শেষেরটি চলেছিল চার মাস, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর থেকে ১৮৭৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত। এর মধ্যে মৃত, উন্মাদ ও আত্মঘাতী হল পঁচাত্তরজন।[১০] পুলিসের কর্তা ট্রেপভ একদিন জেল-খানায় এসে বগলুবভ নামে একটি ছাত্র আসামীকে কাপড় খুলতে বললেন। ছেলেটি কথা না শোনায় তিনি তাকে চাবুক মারলেন। বিচারের রায় বেরুবার পরদিন ভেরা জাসুলিচ নামে একটি মেয়ে ট্রেপভকে গুলি করে আত্মসমর্পণ করল। জুরির বিচারে সে খালাস পেয়ে গেল কারণ পুলিসের কর্তার জেলখানায় গিয়ে আসামীকে চাবুক মারবার কোন এখ্তিয়ার ছিল না। খালাস পাওয়া মাত্র ভেরাকে পুলিস আবার গ্রেপ্তার করবার চেষ্টা করল। আদালতের বাইরে ছিল লোকের ভিড়। তারা রুখে দাঁড়াল, পুলিসের হাত থেকে রক্ষা করল তাকে। ভেরা সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেল বাইরে।

ইতোমধ্যে পিটার এণ্ড পল দুর্গের রাজবন্দীরা কয়েদখানার অসহ্য অত্যাচারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট শুরু করল। কর্তৃপক্ষের অনমনীয় আচরণের ফলে জনকয়েকের মৃত্যু হল। এর পর অকস্মাৎ একদিন সেণ্ট পিটার্সবার্গের একটি পার্কে প্রকাশ্য দিবালোকে গোয়েন্দা বিভাগের মাথা মেজেণ্টসেভ নিহত হলেন। হত্যাকারী স্টেপনিয়াক[১১] পালিয়ে আত্ম-গোপন করল আর 'জমি ও মুক্তি' সমিতি তাদের গুপ্ত ছাপাখানা থেকে "মৃত্যুর বদলে মৃত্যু"

---

[১০] স্টেপনিয়াক : আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা।

[১১] ইনিই "আণ্ডারগ্রাউণ্ড রাশ্যা"র লেখক। স্টেপনিয়াক এ'র ছদ্মনাম, আসল নাম ক্রাভ্চিন্স্কি।

নামে বিপ্লবী প্রতিহিংসার নীতিসূত্র ব্যাখ্যান করে এক পুস্তিকা প্রকাশ করল (অগস্ট, ১৮৭৮)।

ঘটনা দুটিতে বোঝা গেল বিপ্লবী দণ্ডবিধানে লোকসম্মতি রয়েছে। জারের শাস্ত্রে দমননীতি ছাড়া আর কোন প্রতিকার বিহিত ছিল না। দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার কুক্ষণে ওখ্রানাদ নামক পুলিসের দমন বিভাগ গঠন করলেন। শাসনের নামে নির্যাতনের মাত্রা যথাসম্ভব বাড়িয়ে দেওয়া হল।

সন্ত্রাসের জবাবে ভীষণতর সন্ত্রাসের সম্মুখীন হয়ে জমি ও মুক্তির কর্মীদের আত্ম-পরীক্ষায় বসতে হল। দক্ষিণের নগর ওডেসা থেকে এল জেলিয়াবভ, পরিচালকমণ্ডলীর সামনে সে এক নূতন কর্মসূচী পেশ করল। জারতন্ত্রের সঙ্গে লড়তে হলে দীর্ঘকালের প্রস্তুতি চাই, আচমকা কিছু করা যাবে না। বর্তমান দমননীতির আমলে কোন প্রকার সাংগঠনিক প্রস্তুতি সম্ভব নয়, খানিকটা মুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। এই পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্যে সংবিধান পরিষদের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। এতদিন এ আন্দোলন ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল উদারপন্থী অভিজাতদের হাতে। তাদের নরম পথে কাজ হবে না। এক চরম বিভীষিকা দ্বারা এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে হবে। গোয়েন্দা, পুলিস বা সরকারী আমলা নয়, এবারকার শিকার স্বয়ং জার। জারের প্রাণ নিতে পারলে সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে, ভীতত্রস্ত সরকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবিধান পরিষদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবে, তারপর চলবে সমাজবিপ্লবের আয়োজন। সুতরাং সমস্ত বল এখন এক লক্ষ্যে নিয়োগ করতে হবে, দলীয় সংগঠন কেন্দ্রায়িত হবে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে—জারের নিধন।

এই প্রস্তাব সমর্থন করল দলের নেতা মিহাইলভ। এর প্রতিবাদ করল নরমপন্থী প্লেখানভ, একসেলরড ও ভেরা জাসুলিচ। এদের মত হল চাষীদের মধ্যে ধৈর্য ধরে প্রচারের কাজ চালিয়ে যাওয়া। দল দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে গেল, ধৈর্যশীল জ্যেষ্ঠরা হল চর্নী পেরেদল বা 'কালো বিভাগ'। তারা লাভরভের বাণী নিয়ে গেল গ্রামে, রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম ছেড়ে নামল সামাজিক প্রচারে; উত্তরকালে এরা হল সোস্যাল ডিমক্রেট দল। উগ্রপন্থী তরুণরা হল নারদ্নায়া ভলিয়া বা 'জনতার সংকল্প'। তারা বাকুনিনের নাশমন্ত্র নিয়ে চূড়ান্ত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হল, উত্তরকালে এরা হল সোস্যাল রেভলুশেনারী দল। প্রথম দল সংখ্যায় ভারি। কিন্তু বেশির ভাগ তরুণ উদ্যোগী কর্মী এসে জুটল ম্বিতীয় দলে এবং তাদের পক্ষে ভিড়ল সাধারণের সহানুভূতি।

দুই দলের শুধু কর্মসূচীতে পার্থক্য ছিল না, সমাজলক্ষ্যও ছিল আলাদা। জনতার সংকল্পের গোপন প্রচারপত্রে তাদের দার্শনিক মিহাইলভ্স্কি কয়েকটি প্রবন্ধ লেখে। সে ছিল ব্যক্তিস্বাধীনতার ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষপাতী এবং যান্ত্রিক শ্রম বিভাগের বিরোধী। ধনতন্ত্রের আওতায় শ্রমিকজীবন হয়ে যায় একপেশে। কৃষকের জীবনে আছে ভারসাম্য। তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনকে ঘিরে আসবে মুক্ত সমাজ—মাঝখানে ধনতন্ত্রের অভিশাপকে ডেকে আনবার কোন দরকার নেই। ডানিয়েলসন নামে আর একজন দার্শনিক সমাজবিপ্লবে শ্রমিকদের ভূমিকা বর্ণনা করল। উৎপাদনের কাজ পুনর্গঠন করবার দায়িত্ব নেবে চাষী ও শ্রমিকদের কমিউন—যাতে দেশের বিত্ত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের ভোগে না লেগে সর্বসাধারণের কল্যাণে ব্যয় হয়। শ্রমিকদের কমিউন বড় বড় কারখানা গড়বে শুধু নয়, ধনিকশিল্পগুলিকে সমাজশিল্পে পরিবর্তন করবেও তারাই। "রুশকোয়ে বোগাৎস্ত্বো" বা "রুশের সম্পদ" পত্রিকার স্তম্ভে চাষীকমিউন ও শ্রমিক আর্তেলকে ধনতন্ত্রের চাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রচার

চলতে লাগল যাতে এরা একদিন মুক্ত সমাজতন্ত্রের বনিয়াদ হয়ে দাঁড়াতে পারে। 'কালো বিভাগ' দল ছিল গোঁড়া মার্ক্স্‌বাদী। এরা বল্‌ল সমাজের দ্বান্দ্বিক নিয়মে সামন্ততন্ত্রের পরে ধনতন্ত্রকে আসতেই হবে। ধনতন্ত্রের আঘাতে গ্রামীণ ভূমি ব্যবস্থা ভেঙে যাবে তার জন্যে দুঃখ করলে চলবে না। এই ভাঙনের শেষে আসবে সমাজবিপ্লব ও শিল্পাশ্রয়ী শ্রমিক-প্রধান সমাজতন্ত্র। দুই দলের মিতালি হল দুই প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর সঙ্গে। মার্ক্স্‌-বাদীদের সঙ্গে মিলল ধনিকরা। পপুলিস্টদের সমর্থন করল সরকারী আমলাতান্ত্রিকরা—প্রলিতারিয় বিপ্লবকে রুখবার জন্যে রক্ষণশীল চাষী কমিউন হল উপযুক্ত হাতিয়ার।

এদিকে ঐতিহাসিক মারণচক্রের জাল বিস্তৃত হল যথাস্থানে যথাকালে। হঠাৎ প্রধান জালী জেলিয়াবভ গ্রেপ্তার হয়। তার দুদিন পরে, ১৮৮১ সালের ১৩ই মার্চ সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার তাঁর লোহার পাতে মোড়া জুড়ি গাড়ি করে গ্র্যাণ্ড ডাচেস ক্যাথারিনের বাড়ি থেকে তাঁর শীতাবাসে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে এক জায়গায় সোফিয়া পেরভ্‌স্কায়া মাথার ওড়না উড়িয়ে সংকেত করল আর একটি বোমা এসে পড়ল জারের গাড়িতে। লোহার গাড়ির ভেতর জার অক্ষত রইলেন কিন্তু তাঁর কয়েকজন দেহরক্ষী আহত হল। জার গাড়ি থেকে নেমে তাদের দেখলেন, রাইসাকভ নামে যে ছেলেটি বোমা ছুড়ে ধরা পড়েছিল তাকে কি যেন বললেন। তারপর যখন গ্রিনেভটস্কি নামে আর একটি ছেলের পাশ দিয়ে গাড়ির দিকে ফিরছেন তখন ছেলেটির হাতের বোমা পড়ল দুজনের মাঝখানে। দুজনেই ভীষণভাবে আহত হলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দুজনারই পরমায়ু নিঃশেষ হল। পৃথিবীর সবচেয়ে প্রতাপশালী, সবচেয়ে সুরক্ষিত স্বৈরাচারীর মৃত্যু হল শখানেক বিশ পঁচিশ বছরের ছেলেমেয়ের চক্রান্তে।

প্রত্যাশিত সফলতার পর যা ঘটল তা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। জারের মৃত্যুতে ভীত হয়ে স্বৈরশাসন আত্মসমর্পণ করল না। বরং বিপ্লবীরাই জারতন্ত্রের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। একজন সরকারী অফিসার ঠিকই মন্তব্য করেছিলেন—বিপ্লব হয়ে দাঁড়াল কুটিরশিল্প।

পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুসারে 'জনতার সংকল্পে'র পরিচালকমণ্ডলী নূতন জার তৃতীয় আলেকজাণ্ডারের কাছে একটা স্মারকলিপি পাঠাল। তারা প্রস্তাব করল যদি সম্রাট স্বাধীন জনমতে নির্বাচিত একটি জাতীয় মহাসভা গঠন করবার প্রতিশ্রুতি দেন তাহলে তারা হিংসাত্মক কাজ ছেড়ে দেবে এবং বিনাসর্তে মহাসভার কর্তৃত্ব মেনে নেবে। জারের সরকার এর জবাব দিলেন জেলিয়াবভ ও আর চারজনকে ফাঁসি এবং যতজনকে ধরতে পারা গেল ততজনকে কারাদণ্ড দিয়ে। সমিতি ভেঙে গেল—বিপ্লবীরা ছোট ছোট উপদলে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯০৩ সালে বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল ভাঙা টুকরোগুলোকে জোড়া দিয়ে গড়ল 'সামরিক সংগঠন'। ১৯০৫ সালে জারের প্রধান মন্ত্রী স্লেহভে গ্র্যাণ্ড ডিউক সার্গিয়েইর হত্যা এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ পর্ব।

বিপ্লবী হিংসার উৎপত্তি হয় স্বৈরাচারী হিংসা থেকে। হিংসার উত্তরে আসে প্রতিহিংসা। পপুলিস্টরা ঘাতকের মন নিয়ে জন্মায় নি। অপরের জীবনে তাদের ছিল গভীর মমতা, নিজের জীবনের প্রতি তারা ছিল সবচেয়ে নির্মম। তারা জানত হত্যা পাপ—সত্যের জন্যে ন্যায়ের জন্যে হলেও, উপায়ান্তর না থাকলেও। হৃদয়ের কাছে এর ক্ষমা নেই। এই পাপের কালিমাকে নিজের রক্ত দিয়ে ধুতে হয়। তাই হত্যা ও আত্মবলিদান একই কর্ম-সাধনার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিপ্লবের হোমানল এই যুগ্ম আহুতি নিয়ে প্রসব করবে নূতন জীবনমূল্য, নূতন সমাজ যেখানে ন্যায়ের কঠোরতা ও ভালবাসার কোমলতার দ্বন্দ্ব নিরসিত হয়েছে।

জেলিয়াবভকে মৃত্যুদণ্ড দেবার পর তার শেষ অভিপ্রায় জানতে চাওয়া হল। সে বলল জারের হত্যাকারীদের সঙ্গে যেন তাকে বধ করা হয়। পাঁচটি ফাঁসিকাঠ পাশাপাশি সাজানো হল। কর্মসঙ্গিনী ও মানসসঙ্গিনী সোফিয়া পেরভ্‌স্কায়া প্রিয়তম ও দুইজন সাথীকে চুম্বন করে সকলের আগে ফাঁসিমঞ্চে উঠল। তারপর জেলিয়াবভ ও আর দুইজন পরম তৃপ্তির সঙ্গে একে একে এগিয়ে গেল মৃত্যু বরণ করতে। পঞ্চম আসামী রাইসাকভ ভেঙে পড়ল, তাকে টেনে নিয়ে যেতে হল বধ্যভূমিতে। বিপ্লবীর ধর্মে সে হল পতিত। হত্যার পর হত্যাকারীর বাঁচবার অধিকার নেই। নিষ্পাপ জীবন অপরাধে কলঙ্কিত হবার পর, হিংসার ছোয়ায় প্রেম অশুচি হবার পর একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত স্বেচ্ছামরণ।

কার্যসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এরা মরণের জন্যে পাগল হয়ে উঠত। জীবনের বদলে জীবন দিলে তবেই ব্রত উদ্‌যাপন হবে, সেই সার্থক শুভলগ্নের প্রতীক্ষায় এক মুহূর্ত তর সইত না। নৌ-অধ্যক্ষ ডুবাসভের ওপর বোমা ছুঁড়ে ভইনারভস্কির প্রাণবিয়োগ হয়। সে তার ডায়রীতে লিখেছিল, 'মুখ দিয়ে একটি শব্দ বেরুবে না, মুখের ওপর একটি ভাঁজ পড়বে না, আমি ফাঁসির মঞ্চ বেয়ে উঠব...নিজের ওপর এ কোন জবরদস্তি নয়, এই ত' আমার জীবনলীলার পূর্ণতম স্বাভাবিক পরিণতি।' গ্র্যাণ্ড ডিউক সার্গেয়েইর হত্যাকারী কালিয়াএভকে যখন বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হল এবং পাদরি তার সামনে ক্রুশবিদ্ধ যিশুর মূর্তি তুলে ধরল, সে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল তার ও জিনিসের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অথচ দলের মধ্যে কেবল এই ছেলেটি ঈশ্বরে বিশ্বাস করত। আগে আর একটি হত্যাকাণ্ডের অভিযানের সময়ে সে সঙ্গে নিয়েছিল ক্রুশমূর্তি এবং বোমা ছুড়বার আগে দুই হাতে ক্রুশচিহ্ন করে মনকে শক্ত করেছিল।[১২]

এই নরহন্তা আত্মহন্তাদের প্রাণ ছিল ফুলের মত নরম, বিবেক ছিল সূর্যের আলোর মত সজাগ। আহত দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার যখন অসহায় হয়ে বরফের ওপর পড়েছিলেন কয়েকটি ক্যাডেট কুচকাওয়াজ করে সেই পথে ফিরছিল। তারা একটি শ্লেজগাড়ি এনে মুমূর্ষু জারকে তাতে ধরে তুলল। এমেলিয়ানভ নামে একটি ছেলে পাশ থেকে দৌড়ে এল তাদের সাহায্য করবার জন্যে। তার হাতে ছিল বোমা—অল্পক্ষণ আগে সে ওখানে দাঁড়িয়েছিল, জারের ওপর দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যর্থ হলে তার পালা আসবে বলে।[১৩] ডুবাসভকে মারতে যাবার আগে ভইনারভস্কি প্রতিজ্ঞা করেছিল অধ্যক্ষের স্ত্রী সঙ্গে থাকলে সে বোমা ছুড়বে না। 'সামরিক সংগঠনে'র নেতা স্যাভিংকভ ডোরা ও র‍্যাচেল নামে দুটি মেয়ের প্রসঙ্গে লিখছে যে এরা সাহসে ও আত্মদানে কারও চেয়ে কম নয় কিন্তু রক্তপাত এদের অসহ্য। এই ছেলে-মেয়েরা যখন কারও প্রাণ নেবার সংকল্প করত তখন সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করতে ভুলত না যাতে একটিও নির্দোষ লোকের প্রাণহানি না হয়, একটি সাধারণ সিপাই কিংবা বধ্য অফিসারের স্ত্রী ও সন্তানের গায়ও যেন আঁচড় না লাগে।

ন্যায় ও প্রেমের দ্বন্দ্ব পৃথিবীতে আবহমান, কিন্তু তার বেদনা কে এমন করে বহন করেছে? স্থূল মানস সহজ বিচারে একটাকে বেছে নেয় কিংবা বিবেককে প্রতারণা করে। যে সকল ধর্মরাজরা রাষ্ট্রের হাল ধরে আছেন তাদের কাছে হিংসা দূষণীয়, অক্ষমণীয়—ব্যতিক্রম শুধু সরকারের বেলা কারণ সরকারী হিংসা জনহিতার্থে। আর অসহিষ্ণু বিদ্রোহী—যে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হিংসার পিছল পথে পা দিয়ে গড়িয়ে যায়,

---

[১২] আলবের কামু : লাম্ রেভল্তে, অনুবাদ, এণ্টনী বাওয়ার, লণ্ডন, ১৯৫৪, ১৪১-৪২ পৃষ্ঠা।
[১৩] পি. এ. ক্রপট্‌কিন : মেমার্স অব এ রিভলুশনিস্ট, লণ্ডন, ১৮৯৯, খণ্ড, ২, ২৪৪ পৃষ্ঠা।

ক্রমশ তার বিবেক হল শিথিল, হৃদয়ের উত্তাপ ঠাণ্ডা হয়, তাকে গ্রাস করে হত্যার নেশা, তাতে ডুবে যায় ভবিষ্যতের স্বপ্ন। লক্ষ্য যায়, সার হয় উপলক্ষ্য। শাসক ও বিদ্রোহী উভয়ে বরাবর ইতিহাসকে এই ছলনার কাহিনীই দিয়ে গেছে।

রুশ নিহিলিস্টদের ছিল না এই সহজ সমাধান। তাদের দ্বিধা ও সংশয় কাটে নি। তাই তাদের শেষ উত্তর জীবনদান। তারা বলে গেছে—জীবন যে নিয়েছি হিংসায় নয়, ভালবেসে—নিজের জীবন বিলিয়ে তার প্রমাণ দিলুম। বলে তারা সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

কিন্তু সব দিয়েও কি তারা গড়তে পেরেছে কিছু? সে হিসেব বড় কঠিন। দধিচীর অস্থি দিয়ে বজ্র তৈরী হয়, অসুরনিপাত হয়, ইন্দ্রপুরী রচিত হয় না। রুশ থেকে আয়ার্ল্যাণ্ড, আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষ, সন্ন্যাসীর অস্থিতে বৃত্তসংহার হল কতবার, মরলোকে অলকার ভিত্তি পড়ে নি। পরম সৃষ্টির তপস্যায় যারা হারিয়ে যায় বাস্তবের সফলতায় তাদের মাপা যায় না। তারা সৃষ্টিসাধক, নির্মানশিল্পী নয়। তারা ক্রুশবিদ্ধ হয়, চার্চ গড়ে না। তাই মানুষের বুকে তাদের জায়গা, ইতিহাসের পাতায় তাদের স্থান নেই। তাদের তৈরি জমির ওপর বিশ্বকর্মারা ঘর তোলে, ইতিহাস সে কীর্তির সাক্ষ্য দেয়। নিহিলিস্টরা হৃদয় নিঙড়িয়ে লিখেছে কাব্যগাথা, বলশেভিকরা এসে লোহার অস্ত্রে পাথরের ফলকে লিখল ইতিহাস।

হাই

সন্তোষকুমার ঘোষ

সর্বেশ সব দেখছিল এবং শুনছিল। যদিও আপাত-নজরে মনে হতে পারে যে, সে ঘুমিয়ে পড়েছে। চোখ দুটিতে বোঁজাবোঁজা ভাব, ঘাড় এলানো।

—আপনার বিষ কী? সর্বেশ অলকাকে বলতে শুনল, কেমন যেন নকল গলা, কিন্তু খুব মোলায়েম ভঙ্গী।—আপনার বিষ কী? কোন্ পার্টিতে কবে যেন শুনেছিল কথাটা, হুবহু তুলে নিয়েছে, মায় ঢংটি সুদ্ধ। ডাঁট সমেত যেমন ফুল তুলে নেয়, চুলে পরবে বলে।

উনিই আমার স্ত্রী, অলকা রায়, সর্বেশ বলল মনে মনে। অথবা ওর মনেরই ভিতরে একজন আর-একজনকে বলে দিল, মৃদু-স্বরে। একজন অবোধ, জিজ্ঞাসু। অন্য জন সব জানে। আমার স্ত্রী অলকা রায়, যে এই টেবিলের উত্তর মেরুতে বসে আছে এবং ধ্রুবতারার মত আলো বিকিরণ করছে, সে মদ খেতে সাধাসাধি করছে সুমন্ত্রকে, তার বন্ধু সুমন্ত্রকে, একদিন যে আমারও বন্ধু ছিল। ভাবছ, আমি দেখছি না, কিছু শুনছি না, কিছু বুঝছি না, কিন্তু সবই আমি দেখছি, শুনছি এবং বুঝছি।

আপনার বিষ কী, এই প্রশ্নের উত্তরে, সর্বেশ শুনল সুমন্ত্র বলছে, আপনার যা খুশি। এই ঠোঁটে ছোঁয়ালে সবই বিষ। ওই হাত দিয়ে যা দেবেন তাই সুধা।

একেবারে নীলকণ্ঠের পোজ। চাটুকার। ভাঁড়। ভণ্ড। প্রথমে অশুদ্ধ, পরে শুদ্ধ-ভাষায় গাল দিল সর্বেশ, অবশ্য মনে মনে, আর যখন গাল দিল, তখনও ওর গালে চোখের কোণে এক ধরনের মেকি, মিথ্যে, ভদ্র হাসি লেগেই রইল। দাড়ি কামানোর পরেও গালে যেমন একটা নীলচে আভা ছড়িয়ে থাকে।

—আপনাকে কী দেব? এবার অলকা জিজ্ঞাসা করছে সেই ছেলেটিকে, একটু আগে যার নাম নবনী বলে সর্বেশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নবনী মাথা নীচু করে বসেছিল। সে তটস্থ হয়ে বলে উঠল, না-না! আমার কিছু চাই না।

কানের দুল নাড়িয়ে অলকা হেসে উঠল। ওই দুল নাড়ানোর ধরনটাও মদ-পরিবেষণের মত; নেশা ধরানোর চেষ্টা আছে।

—খাবেন না, কিছু খাবেন না? অলকা বলছিল, চুপ করে বসে থাকবেন? এই গরমে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে যে!

নবনী, লাজুক নবনী এবং তন্মুহূর্তে বিব্রত এবং ভীত নবনী মুখ কাচুমাচু করে বলল, অভ্যাস নেই।

কত বয়স? সর্বেশ মনে মনে বিচার করে দেখছিল। আঠারো? কুড়ি? বাইশের বেশি না। ওঁকি দাড়ি কামায়? চোখ কুঁচকে তাকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মত করে সর্বেশ পরখ করল। কামায়। সদ্য শুরু করেছে। সপ্তাহে একবার কি বড়জোর দুবার। তার বেশি না। মাসে তবে ক'টা ব্লেড লাগে, তিনটে? গ্লাসে ঘষলে বোধ হয় একটাতেই চলে যাবে, কড়া দাড়ি ত নয়!

আড়চোখে সর্বেশ চেয়ে চেয়ে দেখছিল, আর ওর মনে নবনী এই নামেমাত্র পরিচিত

ছেলেটি সম্পর্কে মমতা জমছিল। মমতা আর তাচ্ছিল্য, দুই-ই। চুক-চুক করে বাছা এখন শরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে। এখান থেকে দেখলে ওর ভঙ্গীটা ঠিক খরগোসের মত : নধর, চিক্কণ, মসৃণ। আর ভীরু-ভীরু। আপনাকে তবে সফট একটা কিছু দিই, অলকা মুখ টিপে হাসতে গিয়েও না হেসে বলেছিল আর সঙ্গে সঙ্গে তাই দিন বলে ছেলেটি হাত বাড়িয়ে গ্লাস নিয়েছে। এখন মাথা নুইয়ে এক-তাল ভয়ের বরফের মত ছেলেটি সুবোধ বালকের মত অরেঞ্জ স্কোয়াশ গলাধঃকরণ করছে।

সর্বেশের দেহ থেকে একটি সূক্ষ্ম শরীর যেন নির্গত হল এবং ছেলেটির পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বলল, ভুল করলে ব্রাদার, ভুল করলে। একটু খেয়ে দেখলে পারতে। না-হয় শুধু চাখতে? তা-হলে তোমার সাহস বাড়ত, নিজেকে পুরুষ-পুরুষ ঠেকত। কানের গোড়া তেতে উঠত, ঘাড়ের রগ শক্ত হত, চোখ চকচকে হত। তা-তো নয়, তুমি নিজে বরফ, গলায় আরও খানিক বরফজল ঢালছ! অভ্যাস নেই—আরে ওটা কি আবার একটা ছুতো হল নাকি। সবই অর্জন করতে হয়। স্তন্যপান ছাড়া সব কিছুর অভ্যাস। রুটি-বিস্কুট, মাংস-মাছ এর কোন্‌টা তুমি ভূমিষ্ঠ হয়েই খেতে শিখেছিলে? গাছে ওঠা, সাঁতার কাটা, সাইকেলে চড়া—সব কিছুর মত মদ খাওয়াও একটা শিক্ষা এবং অভ্যাস।

সর্বেশ নবনীকে তোতাপাখির মত পড়িয়ে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার চেয়ারে ফিরে এল। অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীর আবার তার দেহে মিশে গেল।

আমি এ-রকম পারি, সর্বেশ ভাবছিল, সূক্ষ্ম শরীর হয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পারি। একটু বাইরে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে মন্দ লাগে না। একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত শোফার যেমন কখনও কখনও গাড়ি থামিয়ে বেরিয়ে আসে, একটু জিরিয়ে নেবে বলে। যতক্ষণ গাড়ি চলছিল ততক্ষণ গাড়ির সঙ্গে সে একাত্ম; প্রকৃতপক্ষে গাড়ির আত্মা (বলতে যদি কিছু থাকে ত) সেই। তার ইচ্ছাই তখন কেন্দ্রীভূত মোটরে, দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট স্টিয়ারিং-য়ে। গাড়ি পার্ক করে বেরিয়ে এসে আড়চোখে সে যখন গাড়িটাকে চেয়ে দেখে, তখন কী দেখে? আমি যা দেখছি।

আমি দেখছি, আমার স্ত্রী অলকা রায় এখন আমার হাতে একটা গ্লাস গুঁজে দিচ্ছে। উপরে ফেনা, তলা রঙিন। আমার 'বিষ' কী? আমার হাত একটু উঠে গ্লাসটা শক্ত করে ধরল, আমার ঠোঁট অল্প নড়ে উঠে কী বলল—ধন্যবাদ?—জানি না। আমার শরীরের বাইরে আমি এখন, হাত বল, ঠোঁট বল, কিছুই আমার বশ নয়।

যদি ওই শরীরে ফিরে যাই এবং চোখ দুটিকে ফের নিজের করে পাই, তবে দেখতে পাব আমার স্ত্রী অলকা রায় ফিরে গেছে তার চেয়ারটাতে। আমার স্ত্রী? এখানে সর্বেশের বুট-পরা ভাবনা একটা খোয়ায় ঠেকে ঠোক্কর খেল—চেয়ারে বসে যে এখন পা দোলাচ্ছে, তার কতটুকু আমার স্ত্রী? যে শিকলে ওর শরীর জড়ানো সেই শিকলটা নিশ্চয় নয়, পিঠকাটা হাতকাটা ব্লাউজটাও না। তবে? ওর চকচকে পিছল কপাল, গাল বা নাকের ডগা ছুঁলেই ওকে কি আমি পাব, বোধ হয় না। ছুঁলে খানিকটা চটচটে রঙ আঙুলে উঠে আসবে। ওই রঙটা অবশ্যই আমার স্ত্রী নয়, আমার কেন, কারোরই স্ত্রী হতে পারে না।

সুমন্ত্র তখন দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করছিল, নবনী ঘামছিল। সর্বেশ ভাবল উঠে গিয়ে ছেলেটির মুখ রুমালে মুছে দিয়ে আসে। নবনী, আবার বলছি, তুমি মদ একটু চাখলেও পারতে। ওই যে শিফনে-মোড়া অলকা রায়কে দেখছ, আলকাথিন কাগজে জড়ানো প্যাকেটের মত, উনি বড় সহজ ঠাকরুন নন। তোমার ঘাড় মটকাবেন। কত কাছে গিয়ে বসেছেন দেখছ

না, নিশ্বাস তোমার গালে নিশ্চয় লাগছে। আড়াই-প্যাঁচ কষে শাড়ি পরেছেন, হুঁসিয়ার। জবাই করার ব্যাপারেও আড়াই-প্যাঁচ বলে একটা ব্যাপার আছে শুনেছি।

সর্বেশ সুমন্তর উপরেও নজর রাখছিল। মোটে দু'পাত্র চড়িয়েছে, এরই মধ্যে চোখ ঢুলুঢুলু, একেবারে ধ্যানীবুদ্ধ? মনে মনে, টিটকারি দিয়ে উঠল সর্বেশ। তুমি না পুরুষ? তোমার চেয়ে ত দেখছি অলকাও স্টেডি। হ্যাঁ, আমার স্ত্রী অলকা রায়ও।

যে-অলকা রায়কে, সুমন্ত্র আমার কাছ থেকে তুমি সরিয়ে নিয়েছ। সরিয়ে নিয়েছ, অবশ্য দৈহিক সমীপ্যের দিক থেকে নয়, মনের দিক থেকে। সুমন্ত্র—নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠে সর্বেশ বলল, সুমন্ত্র আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

উত্তেজনায় সর্বেশের মুখ রক্তাভ হয়েছিল। সে স্থির হতে, ভারসাম্য ফিরে পেতে আকাশের দিকে তাকাল। এই ভারসাম্যের ব্যাপারে আকাশের জুড়ি কেউ নেই। কে কবে টাঙিয়ে রেখেছে চাঁদোয়ার মত করে, কোন্ আদ্যিকালে, আজও এতটুকু ঝুলে পড়েনি।

এখন সেই চাঁদোয়ায় প্রকাণ্ড একটা জ্বলজ্বলে 'ডুম' ঝুলছে, যার নাম সম্ভবত চাঁদ। আর চাঁদোয়াটারই ছেঁড়া খোঁড়া কোনো কোন দিয়ে ফুরফুরে হাওয়া ঢুকছে।

সর্বেশ কৃষ্ণচূড়া গাছটাকেও দেখতে পেল। এই গাছটার ডালে ডালে, এখনও এই সন্ধ্যাতেও, খানিকটা জ্বাল দেওয়া ঘন রোদ্দুর লেগে আছে।

আর, তার পাশে রাধাচূড়া। সবুজ লনের ওপর অকাতরে তার ফিকে-হলদে ফুল ঝরিয়েই চলেছে। মুঠো মুঠো খইয়ের মত। যেন এক্ষুণি, একটু আগেই এই রাস্তা দিয়ে কারা শবদেহ বয়ে নিয়ে গেছে। শবদেহ কার—বসন্তের? মৃত মধুমাসের জন্য একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সর্বেশ আবার গ্লাসে চুমুক দিল।

আড়চোখে চেয়ে সর্বেশ দেখল, চুমুক দিচ্ছে সুমন্তও।

সুমন্ত্র, সর্বেশ নীরবে বলল, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। আগে তুমি আমার বন্ধু ছিলে। এখন নও। কারণ তুমি আমাকে ছুরিকাবিদ্ধ করেছ।

তোমার মনে আছে সুমন্ত্র, ছয়-সাত বছর আগেকার আর-একটি সন্ধ্যার কথা? তখন তোমার, আমার, অলকার—তিনজনের বয়সই তিরিশের নীচে ছিল। এই লনেই আমরা পা ছড়িয়ে বসেছিলাম। সেদিনও টকটকে রোদ্দুর ক্ষীর হয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের মাথায় জ্বলছিল। রাধাচূড়া ফিকে-হলদে খই ছড়িয়ে যাচ্ছিল। আমরা গল্প করছিলাম, আমরা হাসছিলাম। আমরা নৃত্যনাট্য করব, সেদিনই বুঝি স্থির হল। আমি সুর দেব, তুমি বজ্রসেন—দাক্ষিণাত্যে নৃত্যশিক্ষা করে তার মাস কয়েক আগেই তুমি ফিরেছ, কিন্তু শ্যামা—শ্যামা কে?

ঠিক তক্ষুণি কারও নাম মনে পড়ল না, অতএব কথাটা মুলতুবি রেখে তুমিই প্রস্তাব করলে, একবার গলা ভিজিয়ে নিলে হত না?

অলকা বলল, ঘোলের সরবত দিতে বলি?

সুমন্ত্র, তুমি ঠোঁট বাঁকালে।—ঘোল? ও তো মাথায় ঢালার জিনিস। কিংবা ডিসপেপ্‌সিয়ার পথ্য। বলে আমার মুখের দিকে তাকালে। তাকানোর ভঙ্গীতে ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন ছিল। আমি তাকালুম অলকার দিকে। আমার চোখেও ইঙ্গিত ছিল। সে-ইঙ্গিত অলকা বুঝল। উঠে গিয়ে নিয়ে এল সেই বস্তুটি, তুমি যা চাইছিলে। আর দুটি গ্লাস ঘাসের ওপর রাখল।

দুটো? মোটে দুটো গ্লাস কেন? তুমি বললে।

অলকা আমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

তুমি নির্দোষ-নির্বোধ গলায় বললে, তিনটি নয় কেন, তাই জানতে চাইছিলাম।

এবার আমি অলকার দিকে তাকালাম। অলকা কি লজ্জা পেল, ওর গালে লালের ছোপ লাগল? ঠিক বুঝতে পারি নি।

আমি বললাম, দোষ কী! (আমি স্বামী)।

বন্ধুর অনুরোধ, স্বামীর অনুমতি। অলকা কোনটাকেই ঠেলতে পারল না। পারল না বলেই আমি তাকে ঘৃণা করলাম।

সুমন্ত্র, আমি ঘৃণা করলাম তোমাকেও। কেন না তুমি অনুরোধ করেছিলে। আমাকে। আমি অনুমতি দিলাম কেন!

ঠিক সেই সময় কে তোপ দাগল, প্রকাণ্ড একটা গোলার মত চাঁদ ছিটকে পড়ল আকাশে, ভয় হল এই বুঝি আমাদের মাথায় ফেটে পড়ে। না, সে-রকম কিছু ঘটল না, আকাশে উঠেই চাঁদটা থেমে গেল, স্থির হয়ে চাঁপা রঙের হিম-হিম আলো ঢালতে থাকল।

সেই আলোয় দেখলুম, অলকার চোখের মণি বিলায়িত, অলকার আঁচল স্খলিত, অলকা প্রগলভ। আমার স্ত্রী অলকা, ঘরের বউ অলকা, হঠাৎ অন্য অলকা হয়ে গেছে।

তাকে আমি একটা চড় মেরে থামাতে পারতুম। কিন্তু যে-অলকার চোখের দৃষ্টি তখন গোল-গোল, ছড়ানো, সে-ই আমার স্ত্রী কিনা তাই ঠিক করতে পারছিলুম না—পরনারীর গায়ে হাত তুলব কী?

পুরনো কথায় কখন যেন আমরা আবার ফিরে এলুম।

অলকা হঠাৎ বলে উঠল, সুমন্তবাবু, শ্যামা—শ্যামা ত আমিও হতে পারি!

সুমন্ত্র, তুমি বললে, পারেন, পারেনই ত। কিন্তু—

অলকা বলল, আমি নাচ জানি সুমন্তবাবু। অলকার গলা গাঢ়, আকাশে তারা ছিল, আরও বাড়তি দুটি তারা ঝিলিক দিল অলকার চোখে।

আর বলতে হল না, সুমন্ত্র, তোমার উৎসাহ এবং গলাধঃকৃত পানীয় দুইই সেদিন মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। তোমরা গুণগুণ করে আলাপ করছিলে, বাহাত তা নৃত্যনাট্য নিয়ে, আসলে গুণগুণ করবার জন্যেই তোমরা গুণগুণ করছিলে। মাঝে মাঝে আমার দিকে সায়ের আশায় চাইছিলে। আমি ঘাড় নেড়ে যাচ্ছিলুম; এ-ও বুঝেছিলুম যে, আমি সঙ্গতের তবলা ছাড়া কিছু না।

আমি, সুমন্ত্র, ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিলুম। প্রকাণ্ড চাঁদটা শিরীষের ডালপালা আর পাতার জালে ধরা পড়ে গিয়েছিল, বাগানের কোণে আমার ঠিক পিছনেই কালো ভালুকের শরীরের মত একটা ছায়া থাবা তুলে এগিয়ে আসছিল। আমি আস্তে আস্তে পিছিয়ে সেই ছায়ার মধ্যেই মিলিয়ে গেলুম। তোমরা, তোমাদের দুজনের কেউই আমাকে দেখতে পেলে না। আমাকে কে যেন বলে দিল, ওই ছায়াই আমার আশ্রয়।

সেই থেকেই সুমন্ত্র, আমি দূরে আছি, সরে আছি।

নৃত্য-নাট্যের মহলা হল, নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ হল। সুখ্যাতিও হল। শেষ পর্যন্ত সুর আমি দিই নি—শরীর খারাপ এই অছিলায় ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক রেহাই নিলুম।

ড্রপ পড়ে, ড্রপ ওঠে, হাততালি আর থামে না। সব শোক একে একে নেমে যায়, কিন্তু অলকা আর তোমার কথা আর ফুরোয় না। এক পাশে দাঁড়িয়ে তোমরা কথা বলছিলে, বলেই চলেছিলে। খুব মৃদু কথা, খুব মুগ্ধ চোখ, গাড়ির ভিতরের অন্ধকারে বসে আমি সব দেখছিলুম। আমি সব শুনছিলুম। ঠোঁট-নড়া দেখে সব শব্দ আন্দাজ করা যায়। যারা

কালা তারা কিছু কি শোনে না?

আসবার সময় অলকা তোমার হাত ধরে আলগোছে একটু চাপ দিল, তা ত দেখলুম যে।

ঘরে ফিরে অলকা, তার শরীরে তখনও নাচের সাজ, চোখে কাজল, সেই কাগজে কী কালি, কী কালি, কী কালি, ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে। পাখাটাকে পুরো-দম করে দিল। হাঁ করে লোকে যে-ভাবে ঢকঢক করে জল গেলে, সেইভাবে হাওয়া গিলল। তাতেও বুঝি ওর ক্লান্তি গেল না। হাই তুলে বলল, আঃ, শরীর যেন ভেঙে পড়ছে। গিঁটে-গিঁটে কাল নিশ্চয়ই ব্যথা হবে।

আমি কোন মন্তব্য করলুম না। বোবা এবং কালা বনে গিয়ে বসেই ছিলুম।

অলকার কাঁধে একটা পোকা এসে বসছিল। সেটাকে উড়িয়ে দিতে সে বারকয়েক ফুঁ দিল। অলকা বারবার সতৃষ্ণ চোখে চাইছিল বন্ধ আলমারিটার দিকে। ওটার ভিতরে কী ছিল, আমি জানি। অলকা বোধ হয় চাইছিল, সেটাকে খুলে এনে আমি ওকে ঢেলে দিই। ওর পিপাসা আর স্পর্ধা দুইই বেড়েছিল। আমি কিছুই করলাম না, যেন ওর মনের ভাব বুঝিনি অথবা যেন আমার নড়বার ক্ষমতা নেই এমন ভান করলুম। অর্থাৎ খালি কালা আর বোবা নয়, আমি খোঁড়াও হয়ে গেলুম।

তখন সুমন্ত্র, অলকা নিজেই উঠল। আনল বোতল, রাখল দুটি গ্লাস। আমারটাও ভরে দিতে যাবে, আমি তখন হাত তুললুম। ভাঙা-ভাঙা, যেন অন্য কারও গলায়, বললুম, না আমাকে না। আমি খাব না।

—খাবে না কেন?

এতক্ষণ একটা মুখোস মুখে এঁটে ছিলুম। অলকার ওই কথায় সহসা সেটা টুটিয়ে বিশ্রীভাবে হেসে উঠে বললুম, 'এক পরিবারে একজন মাতালই ত যথেষ্ট। দুজনের দাম যোগানো কি সহজ হবে!'

অলকার মুখ পলকে কালো হয়ে গেল। অর্থাৎ পেগ্ট করবার আগে যা ছিল, তার চেয়েও ময়লা দেখাল। বলল, আমাকে তুমি হিংসা করছ। আমাকে, আমার সাক্সেসকে।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলুম, ঈশ্বরের দিব্যি, তা নয়, তা না।

অলকা বলল, হ্যাঁ তাই। তুমি বরাবরই কর। করে এসেছ। আমি যে আর্টিস্ট, এটা কোন দিন মানতে চাওনি। কোন দিন সুযোগ করে দিতে চাওনি আমাকে। শুধু নিজেরটা নিয়েই মেতেছ। মীন, জেলাস, সেলফিস! সুমন্ত্র, সুমন্ত্র কিন্তু আমাকে দেখেই চিনেছে।

তখন, সুমন্ত্র, আমার লোভ হয়েছিল, ওর হাত থেকে গ্লাস কেড়ে নিয়ে আমি ঢকঢক করে খেয়ে ফেলি। লোভ নিরস্ত করে ফোঁসফোঁস করে আবার বললুম, না, কক্ষণো না।

কক্ষণো না? যেন ফেটে পড়ে অলকা বলছিল, নিশ্চয়ই তাই। তোমাকে বলিনি আমি, স্কুলে নাচের জন্যে আমি মেডেল পেয়েছিলুম? গুরু শঙ্করনাথ একবার নাচ দেখে ফিরে গিয়ে আমাকে চিঠিতে কী লিখেছিলেন, তোমাকে বলিনি? লিখেছিলেন, আমার ফিগার মার্ভেলাস, আমার নাচ ডিভাইন।

—আঃ অলকা, আমি হাত তুলে ক্লান্ত স্বরে বললুম, এই নিয়ে এই গল্পটা আমার তেত্রিশবার শোনা হল।

সুমন্ত্র, তবু অলকা থামল না। সেদিনকার সাকসেস, সেদিনকার নেশা আর তখনকার রাগ মাথার মধ্যে মিশে মিশে ওকে পশুবৎ ক্ষিপ্ত করে তুলেছে, অলকা বলল, শুনেও তুমি করেছ কী শুনি? আমাকে সেই খাঁচাতেই তো পুরে রেখেছে? সর্বেশবাবু, তোমাকে আমি

চিনেছি। সুমন্ত্র ভাগ্যে এল, তাই—

লক্ষ্য করলুম, সুমন্ত্রর 'বাবু' লেজুড়টুকু ঘুচিয়ে দিয়ে অলকা সেটা আমার নামের সঙ্গে জুড়ে দিল।

সুমন্ত্র, সর্বেশ বলছিল, সেই থেকে আমি তোমাকে ঘৃণা করি। নৃত্য-নাট্যের বহু পুনরভিনয় হয়েছে, আমি বহিরাগত দর্শকের মত দেখেছি। মঞ্চ আর নেপথ্য দুইই। তোমাদের অনেক গুণগুণ, অনেক হাত-ধরাধরি। দর্শক থেকে তোমরা আমাকে দার্শনিক করে তুলেছিলে। আমি ভাবতাম, খুব কাছে থেকে এই কবছর ধরে নিবিড় সংস্পর্শ দিয়ে আমি অলকার যেটুকু জানলাম আর পেলাম, তুমি কি সামান্য একটু ছোঁয়া দিয়ে তার চেয়ে বেশি কিছু পেলে?

অলকাকে তুমি আর্টিস্ট করেছ সুমন্ত্র, আমি করতে পারিনি। তাকে তুমি মদ ধরিয়েছ, আমি ধরাতে পারি নি। আমি এ-সব অক্ষমতাই স্বীকার করছি। যেমন সুমন্ত্র, গুরু শঙ্করনাথ কোন চিঠিতে অলকা কী লিখেছিলেন, সে-গল্পও তুমি যত মুগ্ধ চোখ নিয়ে গদ্‌গদচিত্তে শুনেছ আমি তা শুনতে পারিনি।

সমস্তই আমার অক্ষমতা।

যেমন এখনও আমি সোজা হয়ে আর বসতে পারছি নে, পালাব বলে ছটফট করছি, এ-ও আমার অক্ষমতারই প্রমাণ।

সত্যিই সর্বেশের হাই উঠছিল। সে ঘুমিয়েও হয়ত পড়ত, যদি-না অলকা বলত, খাবার বোধ হয় দেওয়া হয়েছে। তোমাদের বেশ চনচনে খিদে হয়েছে ত?—তবে ওঠ।

এ কী বিশ্রী অভ্যাস হয়েছে আমার, খেতে বসেও আড়চোখে সব দিকে তাকাই কেন। আমার চোখ দুটোও শেষ পর্যন্ত ট্যারা হয়ে যাবে নাকি?

নইলে এই যে, শ্বেতপদ্মের মত আধখোলা তোয়ালে, সুরভিত ভোজ্য, এ-সবে আমার নজর নেই কেন, আমার মন একটা ভন্‌ভন্‌ মাছি হয়ে কেবলই একটা দূষিত স্মৃতির উপরে বসতে চাইছে। কিছুতে ভুলতে পারছি না যে, যে-লোকটা আমার পাশে বসে, যার নাম সুমন্ত্র, এককালে যে আমার বন্ধু ছিল, সে আমাকে গত কয়েক বছর ধরে বড় নিষ্ঠুর যন্ত্রণা দিয়েছে। রোজ সন্ধ্যায় এখানে এসেছে ও, অলকাকে কাছে টেনে নিয়েছে।

আমি সব দেখেছি, দীর্ঘশ্বাস চেপে সর্বেশ ভাবল, সব সয়েছি। সয়েছি কেননা, আমি ভদ্র, আধুনিক এবং সভ্য। কুকুর হলে যে-দাঁত দিয়ে এই লোকটার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে ছিঁড়ে ফেলতাম, চিবিয়ে খেতাম, সভ্য নাগরিক এবং মানুষ বলেই সেই দাঁতগুলোই বের করে ওকে দেখলে এখন আমি হাসি।

যেমন আজও হেসেছি।

আজও সুমন্ত্র এল কেন, এল যদি ওই বাচ্চা ছোকরাকে নিয়ে কেন, আর অলকা ওদের ঘটা করে খেতে বললই বা কেন, সর্বেশ ভেবে পাচ্ছিল না। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। হয়ত আবার একটা নাচ-টাচ নামানোর মতলব আছে ওদের। মুটিয়ে ত লাশ হয়েছে অলকা, এখনও নাচার শখ?

মাছের কাঁটা চুষছিল সর্বেশ, আর সব দেখছিল। অলকা যেন একটু সরে বসেছে, ওই নতুন ছেলেটির কাঁধ ঘেঁসে? ওর পাতে চামচ দিয়ে আর একটা মাছ তুলে দিচ্ছে? নতুন নাচের টাকাটা কি ওই ছোকরাই যোগাবে নাকি!

এই সব প্রশ্ন পিন্‌ হয়ে সর্বেশের কলিজার কুশনে বিঁধছিল, অস্থির চঞ্চল হয়ে সে এদিক-ওদিক চাইছিল। কিছু মাত্র ভাব বৈলক্ষণ্য নেই সুমন্ত্রর মুখে, সে কোন-কিছু যেন নজরে আনছে না।

আনছে, আনছে, দিব্যি আনছে, শুধু মুখে একটা বৈরাগী নিরাসক্তি ফুটিয়ে তুলেছে বাছাধন। সর্বেশ এও ভাবল যে, সুমন্ত্র আসলে জ্বলে পুড়ে মরছে নবাগত নবনীর সঙ্গে অলকার এতটা মাখামাখি দেখে। নৃত্যনাট্যে কোন্‌ পার্ট নেবে নবনী—উত্তরীয়ের?

যদি এই মুহূর্তে একটা ইঁদুর হতাম আমি, সর্বেশ ভাবল, তা-হলে বেশ হত। টেবিলের তলায় চলে যেতাম, দেখতাম ওখানে কী ঘটছে। সে-ও কম মজা না, হয়ত দেখতাম, নবনীর পা আলগোছে চাপ দিচ্ছে অলকার পায়ে, আর নবনীকে লাথি মারবে বলে সুমন্ত্রর পা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। আমি দর্শক, তখন মুষিকো-ভূত, তাই দেখে চুকচুক করে তারিফ করে উঠতাম।

কিন্তু ওপর থেকে সর্বেশ যা দেখতে পাচ্ছে তা এই : নবনী আর অলকা চাপা গলায় গল্প করছে, সুমন্ত্র নির্বিকার, তার মুখ একটু তোলা যার ফলে সর্বেশ এখান থেকে তার নাকের ভিতরটাও দেখতে পাচ্ছে। লম্বা একটা লোম, তার ডগায় সর্দির পুঁটুলি, কিন্তু নাকটা ঈষৎ স্ফীত।

সর্বেশের হাসি পাচ্ছিল, ওই নাকের গর্তের শেষ কোথায় সে ভাবছিল। হয়ত ব্রহ্মরন্ধ্রে, হয়ত বা কণ্ঠনালীতে কিংবা হৃদয় বলে কিছু যদি থাকে ত সেখানে। হয়, চোখের রহস্য নিয়ে এ-যাবৎ কম কাব্য লেখা হল না, কিন্তু নাকের ফুটোর রহস্য নিয়ে আজ অবধি কেউ বোধ হয় এক লাইনও লেখেনি।

সুমন্ত্রর কষ্ট হচ্ছে, যে-যন্ত্রণা সে সর্বেশকে দিয়েছে সে-যন্ত্রণা সে আজ নিজে পাচ্ছে, এ-কথা মনে হতেই সর্বেশ অদ্ভুত একটা তৃপ্তি পেল। এবং যেহেতু তার পেট ভরে এসেছিল অতএব পরম পরিতোষ সহকারে সে একটা ঢেকুর তুলল।

আরও পনেরো মিনিট পরে সর্বেশ পাশের ঘরে বসে মুখ টিপে হাসছিল আর জানালার সার্সিতে নিজের যে-ছায়াটা পড়েছে তাকে লক্ষ্য করে বলছিল, হুঁ-হুঁ বাবা, কেমন ফন্দী বার করে বেরিয়ে এলাম বল দিকিনি? ভাগ্যিস বুদ্ধিটা চট করে মাথায় খেলেছিল। যেই খাওয়া শেষ হল, অমনি উঠে দাঁড়ালুম। কফির জন্যে অপেক্ষা করলুম না পর্যন্ত। অলকা ভ্রূ কুঞ্চিত করেছিল—উঠছ যে? ফস করে আমি বলে ফেললুম, বাথরুমে যাব। অলকা আর কিছু বলতে পারল না। এখন করুক ওরা যত খুশি গল্প গুজব, হাসি তামাশা আমার আর কিছুতে কিছু যায় আসে না।

মাঝের দরজায় পর্দা উড়ছিল। সর্বেশ সব দেখছিল এবং শুনছিল। ওরা তিনজন এখনও যথাপূর্ব গল্পনিমগ্ন। কিন্তু সুমন্ত্র স্পষ্টতই যেন একটু অন্যমনস্ক, চ্যুত-ধৈর্য, যেন উসখুশ করছে?

চুক-চুক-চুক। আহা। সর্বেশ অসতর্কভাবে একটা সহানুভূতিসূচক ধ্বনি উচ্চারণ করে উঠল।—আহা। বেচারা। উঠে আসতে চাইছে কিন্তু পারছে না। ওর কি গরম লাগছে, ছার-পোকা কামড়াচ্ছে? অথবা সেই স্যাঁতসেঁতে কাঁপুনি নাকি—জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চায়?

একবার চোখাচোখি হতেই সর্বেশ চোখ টিপে উঠে এস বলে ইসারা করল সুমন্ত্রকে,

কিন্তু সুমন্ত্র বোধ হয় দেখতে পেল না। দ্বিতীয় চোখে চোখ পড়তেই সর্বেশ ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকল। এবার দেখতে পেল সুমন্ত্র, চেয়ার ছেড়ে বিড়বিড় করে কী-যেন বলে এদিকে এল।

চৌকাট পেরোতেই সর্বেশ হাত বাড়িয়ে তার হাত মর্দন করল।—এস ব্রাদার, সেই কখন থেকে সিগন্যাল করছি দেখতে পাওনি? শুধু রুমাল ওড়াতেই যা বাকী রেখেছি। উঠে আসার ছুতো খুঁজে পাচ্ছিলে না বুঝি?

—না। সুমন্ত্র রুমালে মুখ মুছল।—ভাবছিলুম অভদ্রতা হবে।

—উঠে আসতে চাইছিলে কেন?

—ভাল লাগছিল না। সুমন্ত্র হাসল। একটু ঝুঁকে পড়ল সর্বেশের দিকে।—অলকা সেই গল্পটা এখন বলছে, সুমন্ত্র সর্বেশকে বলল অন্তরঙ্গ চাপা স্বরে।

—কোন্ গল্পটা?

—গুরু শঙ্করন না কে যেন অলকাকে কবে কী লিখেছে। এ গল্প আমার মুখস্থ। এই সাত বছরে অন্তত একুশবার শুনেছি।

সর্বেশ উঠে গিয়ে পাখাটার জোর বাড়িয়ে দিল। ফিরে এসে বলল, আমি শুনেছি পঁয়ত্রিশবার।

তখন দু-জনে এক সঙ্গে গলা মিলিয়ে হেসে উঠল। পাখাটা জোর ঘসঘস করছিল, সে-শব্দ বাইরে গেল না। শুধু সুমন্ত্রর লম্বা লম্বা চুলগুলো সামনের দিকে ঝুলে পড়ল।

উঁকি দিয়ে পর্দার ওপাশটা দেখে সর্বেশ বলল, থপথপে, মোটা। কোমরে-বুকে-গলার বেড়ে তাগত নেই—উনি নাকি এখনও নাচবেন।

সুমন্ত্র বলল, নবনী বেচারা! এখনও হাঁ করে ওই গল্পটা গিলছে। কী মজা পাচ্ছে, ওই জানে।

মাথা নেড়ে নেড়ে গম্ভীরভাবে সর্বেশ বলল, জানবে না তো, আমরা কেউ জানব না। অনেক রহস্যই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যায়। ফাঁকা ডাস্টবিনে মুখ দিয়ে কুকুর কী সুখ পায়, আমরা কেউ কি তা জানি?

জানি না, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সায় দিয়ে সুমন্ত্র বলল, জানি না। কিন্তু ওকেও আমরা ডেকে আনি না এখানে, ওকে উদ্ধার করব না।

সর্বেশ হাত তুলে বলল, কেন, গোবৎস পরম সুখে গাভীর কাছে আছে, থাক না। পরে প্রাজ্ঞ পেচকের গাঢ় কণ্ঠ অনুকরণ করে সর্বেশ বলল, ব্যস্ত হয়ো না, ও-ও আসবে।

—কখন?

—আসবে, আশ্বাসের ভঙ্গীতে সর্বেশ আবার বলল, আরও তিন কি চার বছর পরে। ওরও যখন ওই গল্পটা একুশবার শোনা হয়ে যাবে। ঠিক বাইশবারের বার ওই নবনীও পালিয়ে এই ঘরে আমাদের পাশে বসবে। ব্রাদার, ব্যস্ত হয়ো না।

আর শব্দ করে নয়, ওরা চোখে চোখে হাসল। সুমন্ত্র যেন বুঝল। তখন সর্বেশ খুব আস্তে আস্তে বলল, তোমাকে আমি আজ ক্ষমা করে দিয়েছি ব্রাদার। অনেক যন্ত্রণা তুমি আমাকে দিয়েছ, তবুও করেছি। হালকা গলায় সর্বেশ হা-হা করে হাসল।—স্বামী আর স্ত্রীর প্রণয়ী, দু-জনে গলাগলি বসে। খুব কমিক সিচুএশন, না? এস আমরা আমাদের মুক্তিদিবস সেলিব্রেট করি। ডি-ডে, না কী বলে যেন?

সুমন্ত্র হাই তুলল, সর্বেশ শব্দ করে বোতলের ছিপি খুলল।

আধুনিক সাহিত্য

কী রূপ দেখালে তুমি রূপনারায়ণ
তোমার বুকের 'পরে
ছোট ঢেউ ভেঙে পড়ে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে শিশুর মতন—
অপরূপ রূপনারায়ণ!

ছবি-ছবি গ্রাম,
তার মাঝে জেগে ওঠে তাম্রলিপ্ত নাম :
সব কিছু মুছে দিয়ে তোমার আশ্চর্য গান,
ভাসে শুধু সারা দিনমান।
হঠাৎ রাত্তিরে শুনি তোমার বুকের নীচে সমুদ্রের ডাক—
হয়েছি অবাক। (৭৮ পৃঃ)

ছোট একটি লিরিক কিন্তু এমন অনুভূতি-শুভ্র কবিতা গত পনেরো বছরে বেশি লেখা হয়নি। মস্ত কোনো কথা নেই, কোনো উদাত্ত ধ্বনি উদ্‌গীত হয়নি, কারুকার্যের চমক নেই, আছে সুডৌল একটি চিত্রকল্প আর সে-চিত্রকল্প ঝ'রে পড়ছে পরিচ্ছন্ন মৃদু শান্ত সুরধারায়। যে-চারটি বিশেষণ এখানে প্রযুক্ত হ'ল, আমার বিবেচনায় সেগুলি দিনেশ দাসের সৃজনী শক্তির যথার্থ পরিচায়ক। "দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা"—শীর্ষক সঙ্কলনে কিছু কবিতা ত্রুটিপূর্ণ, কাব্যহিসেবে উৎকৃষ্ট কবিতা এ-সঙ্কলনে খুব প্রচুর নয়, কিন্তু যেগুলি উৎকৃষ্ট সেগুলিতে লক্ষ্যণীয় সংযম বিদ্যমান, সে-সংযম থেকে শুচিশান্ত সুরের উৎপত্তি। এ-সুর বাঙলা কাব্যে নিতান্ত অনন্য না হ'লেও খুব মামুলি নয়। সংযত ও শুচিস্নিগ্ধ কবিতার জন্য দিনেশ দাস আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে স্মরণীয় অন্যতম ব'লে পরিগণিত হবেন।

কিন্তু এই সংযম ও শান্ত শৃঙ্খলা সহজে দিনেশ দাসের আয়ত্তে আসে নি। তাঁর জীবনী সম্বন্ধে আমি মাত্র সেটুকুই জানি যে-তথ্য ভাবালু ভাষায় "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র শেষে 'কবি-পরিচয়ে' সরবরাহ হয়েছে। এই তথ্য থেকে, "শ্রেষ্ঠ কবিতা"র সূচীপত্র থেকে এবং "কবিতা"-পত্রিকার সঙ্গে প্রথমাবধি আমার নিকট পরিচয় থেকে জানি যে দিনেশ দাস কবিতা লিখছেন প্রায় পঁচিশ বছর যাবত, তিনি তিরিশের দশকে রচনা সুরু ক'রে চল্লিশের দশকে এক আঙ্গিক ও আঙ্গিকী চক্রমণের পরে সম্প্রতি কিছুকাল যাবত সম্ভবত প্রত্যয়ের এক স্থির বিন্দুতে পৌঁছেছেন। উপরে-উদ্ধৃত রূপনারায়ণ সংক্রান্ত কবিতাটি এই স্থির বিন্দু থেকে উৎসারিত, নতুন কবিতা-নামা ১৯৫৪-৫৮ কালবর্তী কবিতাবলীর অন্যতম। যে-সময়ে তিনি কবিতা লেখা সুরু করেন সাম্প্রতিক বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে সে এক সন্ধিক্ষণ। এর কিছুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের অপার নিপুণতা অর্জন করার পরে আত্ম-অভিব্যক্তির কোনো এক স্তরে যেন থেমে গিয়েছিলেন, তাঁর কবিপ্রাণ যেন পরমকুশল আঙ্গিকের

রোমন্থনেই সন্তুষ্ট ছিল, "বলাকা" থেকে "মহুয়া"র মধ্যবর্তীকালে তাঁর লেখা যেন ছাঁচে-ঢালা type হ'য়ে গিয়েছিল। এই কালেই জনকয়েক (তখনকার দিনে) অতি নবীন কবি চেষ্টায় ছিলেন সে-ছাঁচ থেকে বেরিয়ে আসার কিন্তু বাঙলা কাব্যের আকাশে যে-রবিদীপ্তি তা এড়াবে কে? এড়ালেন রবীন্দ্রনাথ নিজেই। "মহুয়া" থেকে সুরু ক'রে সত্তর বছরের বৃদ্ধ প্রতি কাব্যগ্রন্থে যে নিত্যনব জগৎ সৃষ্টি ক'রে চললেন তা'র তুলনা নেই কোনো সাহিত্যেই। নবীন কবিদের পক্ষে সে-এক অভাবিতপূর্ব অভিজ্ঞতা। একদা বলা সম্ভব ছিল 'সম্মুখে রুধিয়া পথ রবীন্দ্র ঠাকুর', তিরিশের দশকে পথরোধী হ'লেন পথিকৃৎ। রবীন্দ্রোত্তর যুগের প্রথম এবং প্রধান কবি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—এমন আশ্চর্য ব্যাসকূট কোনো সাহিত্যের ইতিহাসেই আছে ব'লে জানিনে। পথিকৃতের পেছনে পেছনে যার যার স্বকীয় পথ তৈরি ক'রে নিলেন জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে। বাচ্যবস্তু, ছন্দ এবং বাগৈশ্বর্য—বাঙলা কাব্যের প্রতিটি অঙ্গ ঝলমালিয়ে উঠ্‌ল নতুন গৌরবে। আর এই রবীন্দ্রোত্তর কবিদের প্রয়াসের ফলে বাঙলা কাব্যের ধারা স্রোতস্বিনী হ'ল নবীনতর অনেক কবি আবির্ভূত হ'লেন, তাঁদের পরীক্ষা নিরীক্ষা সার্থকতা হ'ল বহুমুখী। নবীনতর এসব কবিদের অন্যতম দিনেশ দাস।

নবীনতর হওয়ার দরুণ এসব কবিদের যুগপৎ সুবিধা এবং অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। এ'দের বয়োজ্যেষ্ঠদের কঠিন প্রয়াস ছিল রবীন্দ্রানুকরণের দুরপনেয় প্রলোভন থেকে মুক্ত হওয়ার, রবীন্দ্রনাথের ভাষা ও ছন্দ এমন কি তাঁর ভাবেরও হাল্‌কা প্রলেপ মিলিয়ে আপাতরম্য পদ্য রচনা করা অনেকেরই পক্ষে বড়ই সুসাধ্য ছিল, এখনো সুসাধ্য। আমার বিশ্বাস ইংরেজি ১৯৩০ থেকে ১৯৬০ কালবর্তী, হয়তো আরো দীর্ঘ কালবর্তী বাঙলা কাব্যের ইতিহাস যখন রচিত হবে তখন প্রধান বিচার্য বিষয় হবে কোন্ কবি কী পরিমাণে রবীন্দ্রানুকরণে প্রলুব্ধ হয়েছেন অথবা সার্থক স্বকীয়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। শুধু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে মনে হয় জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে'র মহতী কৃতিত্ব স্বকীয়তা অর্জনে, বারংবার রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় সুরের মায়ায় আচ্ছন্ন হ'য়েও এ'রা নিজেদের সুর সৃষ্টি করতে পেরেছেন, প্রত্যেকেই সৃষ্টি করেছেন একাধিক সুর। এ'দের চেয়ে নবীনতর কবিরা রবীন্দ্রনাথের মায়ায় সে-পরিমাণে মোহাচ্ছন্ন হন নি, যতটা হয়েছিলেন এ'রা। পূর্বসূরীদের সাহসিক অধ্যবসায়ী ও নিপুণ পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে নবীনতর কবিদের পথ হয়েছে সরল। কিন্তু অন্যবিচারে নবীনতর কবিদের সমস্যা কঠিন, তাঁদের পক্ষে অনুকরণীয় কবি একমাত্র রবীন্দ্রনাথই নন, সাক্ষাৎ পূর্বসূরী কবিরাও। তিরিশ ও চল্লিশ দশকে যাঁরা কবিতা লিখতে সুরু করেন তাঁদের প্রায় সবারই লেখায় (সুভাষ মুখোপাধ্যায় উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম) অল্পবিস্তর ছাপ রয়েছে পূর্বসূরী কবিদের, প্রায়ই একাধিক কবির। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের ছাপ তো রয়েইছে। দিনেশ দাসের কবিতায় দেখা যায় অনেক কবির ছাপ : বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সব চেয়ে বেশি জীবনানন্দ। তাঁর পরিণত কাব্যপর্যায়েও থেকে থেকে শোনা যায় অধিকতর শক্তিমান কবির সুর। নবীনতর কবিদের প্রলোভন বহুধা, পূর্বসূরীদের বিলম্বিত ছায়াঙ্কিত তাঁদের পথ।

সে জন্যই তিরিশ ও চল্লিশের দশকের বাঙালী কবিরা সাধারণত 'মাইনর' কবি, গৌণ কবি। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ কবি অবশ্য প্রতি যুগেই জন্মায় না—হাজার বছরে এক রবীন্দ্রনাথ—কিন্তু প্রতি পুরুষ পর্যায়ে (generation-এ) দু'চারজন মুখ্য কবির

আবির্ভাব হবে এমন প্রত্যাশা অযৌক্তিক নয়। রবীন্দ্রপ্রতিভার মধ্যাহ্নযুগেও নজরুল মোহিতলাল যতীন্দ্রনাথ সম্ভব হয়েছিল। জীবনানন্দ-সুধীন্দ্রনাথ-অমিয় চক্রবর্তী-বুদ্ধদেব-বিষ্ণু দে'র পরে এ'দের তুল্য মুখ্য কবি কাউকে বলা যায় না, এ'রা যে বয়সে মুখ্যতা সিদ্ধ হ'য়েছিলেন সে-বয়সের কোনো নবীনতর কবি গৌণত্বের গণ্ডী ছাড়াতে পারেন নি। বাঙলায় সম্প্রতি গৌণ কবির যুগ, সে সব কবিদের মধ্যে দিনেশ দাসের স্থান নিঃসংশয়।

২

পূর্বেই বলেছি সংযত ও শান্ত সুর সহজে দিনেশ দাসের আয়ত্তে আসেনি। আমার বিবেচনায় দিনেশ দাসের মস্ত দুর্বলতা শব্দপ্রয়োগে, অনেক কবিতায় হোঁচট খেয়ে অবশেষে রূপনারায়ণের উপর কবিতা লিখতে পারেন পরিচ্ছন্ন শব্দমালায়। 'শেষ তান্ত্রিক' কবিতাটিতে তিনি বলছেন—

আমি কবি আজ
ঘষা পয়সার মত
পুরাতন কথা নিয়ে অবিরত
তুলি তাতে সোনালী আওয়াজ :
আমি কবি মহাতান্ত্রিক,
গলিত শব্দের শবে বারবার
হঠাৎ নতুন প্রাণ করেছি সঞ্চার। (৭৭ পৃঃ)

বেশ বলা হয়েছে কথাটি। যদি চ মালার্মের উক্তি Poetry is written with words, not ideas (কাব্য লেখা হয় শব্দ দিয়ে ভাব দিয়ে নয়) ব্যঞ্জনার্থে গ্রাহ্য নয় কেন না ভাব বর্জিত কোনো শব্দেরই অস্তিত্ব নেই, তবুও একথা অবশ্য আপাত সত্য যে কাব্যের উপকরণ শব্দ, প্রত্যেক কবির কবিত্বের পরিচয় তাঁর শব্দপ্রয়োগে, ব্যবহারজীর্ণ শব্দে নূতন জ্যোতি সঞ্চারের ক্ষমতায়।

Annihilating all that's made
to a *green thought* in a green shade.
—Andrew Marvell

নিঠুর গরজী, তুই কি মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, **সবুর বিহানে?**
—মদন বাউল

নির্দ্দাচিহ্নিত শব্দগুলি ঘষা পয়সার মতো পুরানো কথা অথচ কবির উজ্জ্বল আবেগসম্পৃক্ত হ'য়ে সেগুলি তুলেছে সোনালী আওয়াজ। এহেন শব্দ প্রয়োগ দিনেশ দাসে আদৌ নেই এমন অতিভাষণ ও অলীকভাষণে লিপ্ত হব না কিন্তু তাঁর লেখায় গ্রেশাম-কানুনের মতো ঘষা পয়সার আধিক্যের দরুণ উজ্জ্বল শব্দ কিঞ্চিৎ বিরল বটে। কিছু শব্দপ্রয়োগ নিতান্তই নির্মনা অনুকরণ :

ভ্রমরের মত তার **রুপোলী** গুঞ্জন ভেসে আসে (১৫ পৃঃ)
কখন এলে **গোলাপ-ভোরে**
রক্তপথের সঙ্গী হবার দাও ইশারা—(২৪ পৃঃ)

হাঁক দেয় ওই কালের দৌবারিক (২৬ পৃঃ)
চোখে মায়ার কাজল বুলিয়ে দাও
কান্নাহাসির জীবনদোলা দুলিয়ে দাও। (৩৭ পৃঃ)
জীবন-মরুভূ শুধু ধূ-ধূ করে রুক্ষ অনাদরে (৪৩ পৃঃ)

অনাত্র-এর দৃষ্টান্ত অনেক—শব্দ উজ্জীবিত করার স্বেদাক্ত এবং ব্যর্থ পরিচয় :

তাই তো ওই নখর নখে
ছিঁড়ে গেছে কত তরুণের বুক। (৬ পৃঃ)
(—শব্দভাণ্ডার হাতড়ে একটি মেকী শব্দে কবি সন্তুষ্ট হয়েছেন।)
অশ্রান্ত করুণ ওর গুণগুণানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণ গান। (৭ পৃঃ)
(—সহসা মনে হয় 'মসৃণ' বেশ শব্দ কিন্তু মাটির গানের বিশেষণ হিসেবে এর কোনো টেঁকসই সার্থকতা নেই।)
ভিড় ঠেলে কত ডাঙা, ভাঙাবাড়ি, ভাঙাগ্রাম
পিছনে অনেক গ্রাম, কত বন, বনগ্রাম। (৮ পৃঃ)
(—অনুপ্রাস তো প্রচুর, কিন্তু বনগ্রাম যদিচ কোনো জায়গার নাম হওয়া সম্ভব—কবি তেমন নাম নির্দেশ করছেন না—ডাঙা, ভাঙাবাড়ি ইত্যাদি শব্দে যেমন generic বা সামান্য সংজ্ঞা জ্ঞাপিত হয় বনগ্রাম কথাটিতে তেমন হয় না। নিরর্থক কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে অনুপ্রাসের খাতিরে।)
যার দেহে রাখিয়াছি টুকে
আমার অলেখা যত কবিতার কুচো। (৯ পৃঃ)
(—অথচ অপটু শব্দযুক্ত এই ছত্র দুটির পরেই দুটি সুন্দর জীবনানন্দীয় ছত্র আছে : 'সে-মেয়ে হারায়ে গেছে/ভোরের স্বপ্নের মত আধোখোলা চোখের পাতায়।')
তুমি কি নিয়ে এলে সেই
অসহ বেদনার অসহ অশ্রু! (১০ পৃঃ)
(—কবির শব্দভাণ্ডার খুব ঐশ্বর্যবান নয়।)
ধোঁয়া ওড়ে, মৃত বাষ্প ঘোরে (৭৫ পৃঃ)
(—নিষ্প্রাণ বিশেষণ।)
তোমার কাগজ হ'তে প্রতি ভোরে কাঁচা রক্ত টপে পড়ে (৬৭ পৃঃ)
(—ক্রিয়াপদ 'টপে' বাঙলা বাক্‌রীতি সম্মত ব'লে শুনিনি।)
পুরোনো ধাতুর মত স্থির সবখানে। (৬১ পৃঃ)
(—ধাতু পুরোনো হোক নতুন হোক, সব অবস্থাতেই অচল। 'পুরোনো' এখানে অনর্থক বিশেষণ।)
দুটি ছায়া ঘোরে ফেরে ছায়ার মতই (৬২ পৃঃ)
(—ইংরেজিতে একে বলে bathos; ছায়া ছায়ার মতো ঘুরবে না তো কার মতো ঘুরবে?)
তোমার মুখেও হলুদ নদীর একফালি মেটে হাসি। (৮৫ পৃঃ)

(—নিষ্প্রাণ নিশ্চিত্র বিশেষণ কষ্ট কল্পনার সাক্ষ্য।)
আহ্নিক গতির ঊর্ধ্বে নিটোল নির্গোল। (৬৪ পৃঃ)
(—নতুন কিন্তু অ-সিদ্ধ শব্দ 'নির্গোল'।)
শুচি-শুভ্র হৃদয়ের দুধ। (৭০ পৃঃ)
(—হৃদয়ের দুধ!)

অনেক অপটু শব্দপ্রয়োগ থেকে মাত্র এক ডজন দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হ'ল। শব্দপ্রয়োগের দৈন্যে প্রমাণ হয় দিনেশ দাসের কবিকর্মে মননশক্তির অভাব, সুর ও অনুভূতির সঙ্গে অনুরূপ মেধার সাযুজ্য ঘটেনি, তিনি যেন ভেবে কবিতা লেখেন নি। দান্তে গেব্রিয়েল রোসেটির মতো ভাবপ্রবণ কবিও জানতেন যে শব্দপ্রয়োগের পেছনে fundamental brain-work বিদ্যমান থাকা দরকার। শুধু হৃদয় দিয়ে কবিতা হয় না, কিছু মস্তিষ্কেরও প্রয়োজন, বস্তুত মহৎ কবিতা মহৎ মস্তিষ্কের অভিজ্ঞানে। ইয়োরোপীয় চিন্তাধারায় সাহিত্য ও শিল্পের রোমাণ্টিক সংজ্ঞায় হৃদয়ের মূল্য এত বাড়ানো হয়েছে যে শিল্পভাবনায় মনঃশক্তির স্বীকৃতি হ'য়ে পড়েছে বিস্মৃত, অথচ গ্রীক রোমান ও রেনেসাঁস চিন্তায় এ-স্বীকৃতি উজ্জ্বল। এ-প্রসঙ্গে আমার অন্য এক প্রবন্ধ থেকে দুয়েকটি বাক্যের ব্যবহার করছি : 'প্রাচীন ভারতীয় চিন্তা অনুসারে কবিত্ব এক ধরনের মনন ক্রিয়া। উপনিষৎগুলির ভাষ্য রচনাকালে শঙ্করাচার্য একাধিকবার 'কবি' শব্দটির তাৎপর্য করেছেন 'ক্রান্তদর্শী', 'মেধাবী' অর্থে, সে-অর্থে কবি অবশ্যই মননক্রিয়াশীল পুরুষ...কাব্যের যে-কোনো বিষয়বস্তুতে, যে কোনো প্রকারের কাব্যে (গীতি-উচ্ছ্বল বিশুদ্ধ লিরিক্ কাব্যেও) অল্পবিস্তর মননক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী।' সে-মননক্রিয়া কেবল বাচ্যবস্তুর চিন্তনে সীমিত নয়, শব্দপ্রয়োগে, ছন্দোবন্ধনে, সমগ্র কবিতাটির বুনটে তার প্রয়োজন ও প্রকাশ। সে-মননক্রিয়ার অভাব ও দৌর্বল্য গৌণ কবির লক্ষণ। দিনেশ দাস যে অনবরত নির্মান শব্দে সন্তুষ্ট থাকেন, উৎকৃষ্ট ও অনুৎকৃষ্টের প্রভেদ না ক'রে নিজ স্বল্পপরিসর শব্দভাণ্ডারে হাতের কাছে প্রথমে যে-শব্দটি পাচ্ছেন সেটিকে ব্যবহার ক'রেই তাঁর শিল্পবোধ অক্লিষ্ট, এমন রচনাশৈথিল্যে প্রমাণ হয় তিনি গৌণ কবি। শব্দচয়নে অন্যমনস্কতা, আর তার চেয়েও বেশি দোষাবহ নির্মনস্কতার ফলে দিনেশ দাসে কখনো কখনো প্রায়-সুন্দর-হ'য়ে-ওঠা রচনা নষ্ট হ'য়ে যায়। দুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

আষাঢ়ের সেই প্রথম বর্ষা নামল :
নামল সে সদ্যোজাত শিশুর মত
অবিশ্রান্ত কান্না আর দুরন্তপনা নিয়ে। (৩ পৃঃ)

জাগবে জলের গান
অবিরাম,
আমার পুরোনো ঘরে ফাঁপা দেহালিতে,
খাতার প্রীতির গিঁটে—কলমে-কালিতে। (৬৮ পৃঃ)

প্রথম বর্ষার উপমা সদ্যোজাত শিশু; বর্ষার জলধারা আর শিশুর কান্নায় সাদৃশ্য। বেশ কথা, কিন্তু যে-সদ্যোজাত শিশু দুরন্তপনায় প্রবৃত্ত সে শিশু-শ্রীকৃষ্ণ আর শিশু-হারকিউলিস্ দুজনকেই হার মানিয়েছে। উপমা মানেই সাদৃশ্য আর সাদৃশ্যের মানে নয় সর্বরকমে হুবহু একাত্মতা, ইউক্লিড যেমন বলেন equal in all respects, তবুও সাদৃশ্যবোধ অন্তত সাধারণ অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য হওয়া দরকার। ইংরেজি কবি রবর্ট ব্রিজেস্ কোথায়

যেন বলেছেন যে কাব্যের ভাষা must be at once intellectually satisfying and imaginatively stimulating । উপরোক্ত প্রথম দৃষ্টান্তে 'দুরন্তপনা' কথাটি অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য নয়, সুতরাং কবির ঈপ্সিত সাদৃশ্যবোধ বিপর্যস্ত, উপমাটি অসার্থক, ছত্রটি লেখার সময় কবির মেধা ছিল অবশ। (অথচ কবিতাটির বাকি অংশ বেশ প্রশংসনীয় এবং শেষ ছত্রটি রীতিমতো সুন্দর, তাঁর কবিকর্মের গোড়ার দিকেই সুন্দর রচনা তাঁর সাধ্য ছিল।) দ্বিতীয় উদ্ধৃতির খণ্ড বাক্যটি 'খাতার প্রীতির গিঁটে' এতই স্থূল যে এ নিয়ে অনেক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। যেমন শব্দচয়নে তেমনি উপমা-গ্রন্থনে দিনেশ দাসে অপ্রত্যাশিত শ্লথতা ও নির্মনস্কতা পাঠকের পক্ষে পীড়াদায়ক।

দিনেশ দাস চেয়েছেন ঘষা পয়সার মতো পুরনো কথা নিয়ে তাতে সোনালী আওয়াজ তুলতে। কিন্তু বাক্‌প্রতিমা পাচ্ছি তাঁর কবিতায় সেগুলি ঘষা পয়সা বটে কিন্তু তাতে সোনালী আওয়াজ তোলা হয়নি, আমার বিবেচনায় নয়।

চেতনার উজ্জ্বল **তলোয়ার** যখন ধীরে ধীরে **ঘুমের খাপে** বিশ্রাম নেয়। (১২ পৃঃ)
ঝড়ের দাপটে আমরা ছিঁড়ে যাব। ছিঁড়ে যাবে আমাদের হৃদপিণ্ড—
সেই সঙ্গে ছিঁড়েখুঁড়ে যাবে প্রাচীন **আগাছাগুলো**—উড়ে যাবে
যুগযুগান্তের **আবর্জনা**। (১৩ পৃঃ)
বালুময় **সময়ের সৈকতও** (২৭ পৃঃ)
লালমেঘে একদিন ছেয়ে যাবে দিগ্‌দিগন্তর (৪১ পৃঃ)

এসব বাক্‌প্রতিমার পিছনে কোনো শক্তিশালী অনুভূতি নেই, এগুলি নেহাৎই গতানুগতিক। তিরিশের দশকে যাঁরা কবিতা লিখেছেন ও পূর্বসূরীদের কবিতার সঙ্গে খানিকটা পরিচয়ও রেখেছেন আর হয়তো ইংরেজি কাব্যও অল্পবিস্তর পড়েছেন, কতকগুলি যুগসম্মত বাক্‌-প্রতিমা তাঁদের ওষ্ঠাগ্রে অনায়াসেই উপস্থিত যদিচ হৃদয়াগ্রে না-ও হ'তে পারে। একথা সত্য যে এসব ঘষা পয়সা দিনেশ দাসের প্রথম দিককার কাব্যেই পাওয়া যায় বেশি, তবুও এই কবিতাগুলি কবির শ্রেষ্ঠ কর্ম ব'লে জাহির করা হয়েছে যদিচ কবিতা রচনার ইচ্ছা ও উত্তেজনার অতীত সৃজনীশক্তির নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য এসব উপমায় মেলে না। এহেন অশক্ত উত্তেজনার প্রকাশ কোনো কোনো 'অক্‌সিমরণ' প্রয়োগে :

মাঝে মাঝে ডুব দিই **মুখর নৈঃশব্দ** হ'তে
কল্‌কল্‌ জলের মতই **নির্জন**
জনতার স্রোতে। (৬২ পৃঃ)
শুকনো জলের মত আলো পড়ে ঝরে (৭৩ পৃঃ)

বিপরীতার্থক শব্দযোজনাগুলি আপাতচাতুরী মাত্র, কোনো গভীর অর্থের দ্যোতনা বহন করে না। কয়েকটি উপমা পাচ্ছি আশ্চর্যরকম কর্কশ, নিষ্প্রভ এবং অপরিণত চিত্তসুলভ :

মহাপ্রভু, গরম **বোমার লাড্ডু খাবে**?
* * *
এনেছি তাই **বারুদ-রুটি** রাশীকৃত
মহাপ্রভু, আহার করো! আহার করো! (৩৫ পৃঃ)
মমতা-মোমে গলানো মমতাজ (৪১ পৃঃ)
হে পৃথিবী, চোখ খোলো, খোলো **আঁখি-পক্ষ্মের করাত**,
অন্ধকার যাবে চিরে চিরে (৪৯ পৃঃ)

হৃদ্‌পিণ্ডের ঝুপঝুপে দাঁড় এখনো পড়ে
ছলাৎ ছল (৫৪ পৃঃ)

কোনো অনুভূতি নেই এসব Crude উপমায়। বোমার লাড্ডু, বারুদের রুটি—ইস্কুলের ছেলেদের শব্দকোষে সীমাবদ্ধ। 'ম'য়ের অনুপ্রাস ছাড়া বেচারা মমতাজের কোনো অবশ্যতা নেই মমতা-মোমে গলবার। আর আঁখি পক্ষ্মের করাত ও হৃদ্‌পিণ্ডের ঝুপ্‌ঝুপে দাঁড় কোনো নিষ্কৌতুক রচনায় স্থান পাওয়াটাই কৌতুকাবহ। কবিতা লিখতে নাকি উপমা প্রয়োগ করতে হয়, সব কবিই করেন, আমিও কবি অতএব আমি কবি কোন্ উপমা লাগাব আমার পদ্যে—এহেন সদিচ্ছা থেকে এসব অসংযত অসংবেদী বাক্যযোজনার উৎপত্তি। অন্যত্র কতকগুলি উপমা পাই, সেগুলি ভালো হ'তে গিয়েও হ'তে পারেনি, অনুভূতির ন্যূনতার জন্য নয়, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে আর fundamental brain-workএর দৈন্যে।

তবু এর আড়ালে ফণা তুলে আছে
সেই আদিম যুগের ক্ষুধিত অজগর! (৬ পৃঃ)
(—অজগরের ফণা থাকে না। এ-অজগর মন গড়া।)
শিহরিত কপোতের ন্যায়
তোমার নরম মুঠি আমার মুঠিতে রাখো আগুন-বন্যায় (২ পৃঃ)
(—প্রিয়ার মুঠি রাখা হয়েছে প্রিয়ের মুঠিতে, উপমা প্রয়োগের সুন্দর সুযোগ। ব্রাউনিংয়ের আন্‌ড্রিয়া ডেল্‌ সার্টো বলছে : your soft hand is a woman of itself,/And mine the man's bared breast she curls inside—একটি সুডৌল চিত্রকল্প। দিনেশ দাসের রচনায় মুঠিতে মুঠিতে ছোঁওয়ার শিহরণ ভীরু কপোতের শিহরণের মতো, সে-শিহরণ আগুনের ছোঁওয়ার শিহরণের মতো—এক উপমার বস্তু গড়িয়ে পড়েছে অন্য উপমার বস্তুতে কিন্তু সে-গড়ানোতে বৈসাদৃশ্য নেই, বরং অনুভূতি হয়েছে সূক্ষ্মতর। কিন্তু তারপরেই কবির সংযমাভাব। আগুনের ছোঁওয়া কিন্তু সে-আগুন বন্যার মতো। আগুন অবশ্য বন্যার মতো হতে পারে কিন্তু মুঠিতে মুঠিতে ছোঁওয়া—কপোত—আগুন—বন্যা, এতদূর এসে গড়ানো উপমা তালগোল পাকিয়েছে। সংশয় হয় 'ন্যায়' ও 'বন্যায়' মিলের খাতিরে অনর্থক আগুন-বন্যার অসংযমে পড়েছেন কবি।)
তখনও ঘুমের নরম মোমে
আমার চোখের পাতা দুটি জুড়ে আসে নি। (১১ পৃঃ)
(—মোম দিয়ে কেউ কিছু জোড়ে শুনিনি কেবল দেখেছি শফরে বেরবার সময় তেলের শিশি সুটকেসে ভরার আগে কেউ কেউ গলানো মোম দিয়ে কেউ কেউ গালা দিয়ে ছিপি বন্ধ করেন। তেমন ইঙ্গিত এ-দুই ছত্রে নিশ্চয় নেই, এখানেও 'মোম' এসেছে অনুপ্রাসের অসংযমে—ঘুমের নরম মোম।)
শেষ হ'ল সাম যজু অথর্ব ঋক্
হাঁক দেয় ওই কালের দৌবারিক,
শেষপাতা শেষ হ'ল,
হে নাবিক, পাল তোলো! (২৬ পৃঃ)
(এখানেও ধী শক্তির বিভ্রান্তি, বাক্‌প্রতিমা কোন্ পথে যাবে সে-বিষয়ে কবি

মনস্থির করতে পারেন নি। প্রথম ছত্রে পেলাম কোনো বেদাধ্যায়ীর গৃহ বা আশ্রমের ইঙ্গিত। তারপরে দৌবারিকের উল্লেখ, তার মানে রাজপ্রাসাদ বা দুর্গ বা অন্তত ধনীর অট্টালিকা। অবশ্য প্রাসাদে বা অট্টালিকায় (দুর্গে নয়) বেদপাঠ হ'তে বাধা নেই কিন্তু আশ্রম থেকে দূরে সরে গিয়েছেন কবি। তারপরেই এলো নাবিক। অনুমান হয় নাবিকের আবির্ভাব খানিকটা জীবনানন্দী প্রভাবে, খানিকটা 'হ'ল' আর 'তোলো'র সুশ্রাব্য মিলের খাতিরে। 'দৌবারিক' এসেছে 'ঋক্'-এর খাতিরে। বেদাধ্যায়ী, দৌবারিক, নাবিকের ত্র্যহস্পর্শ অসম্ভব নয় কিন্তু কষ্টকল্পনা বটে।)

আরবের মরু উচ্ছল হ'ল মামুদের গজনীতে
তারি ঢেউ লাগে খাইবার গিরিবর্ত্মের ধমনীতে,

* * *

গুজরাটে কর্ণাটে
খোঁড়া তৈমুর হাঁটে। (২৭ পৃঃ)

('মরু উচ্ছল' সহজে গ্রহণযোগ্য বাক্‌প্রতিমা নয় কিন্তু মরুর ঢেউ বা কোনো ঢেউ কী উপায়ে 'ধমনীতে' লাগতে পারে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। 'গজনী'র সঙ্গে 'ধমনী' ছাড়া অন্য মিল খুঁজে পেলে বাচ্যার্থের এ-দুরবস্থা হ'ত না। পরের দু'টি ছত্র তথ্যবিরোধী। তৈমুর হাঁটতে যাবেন কেন? বেচারা খোঁড়া মানুষ, যা হোক বিশ্ববিজয়ী ব্যক্তি তো, হুকুম না দিলেও হাজার ঘোড়া তাঁর জন্য মজুদ। যদি বা তিনি হাঁটা পছন্দ ক'রেই থাকেন—এ-কবিতার খাতিরে—কখনো তিনি গুজরাটে বা কর্ণাটে গিয়েছিলেন এমন তথ্য ইতিহাসে মিলবে না।)

৩

আমার এই দীর্ঘ ত্রুটি-বিশ্লেষণ কোনো অসূয়াপর ছিদ্রান্বেষণ নয়। দিনেশ দাসের সৃজনীশক্তির আমি অকপট গুণগ্রাহী তার আভাস দিয়েছি এ-প্রবন্ধের গোড়াতেই। এ-বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য এইটে প্রমাণ করা যে অনেক অনিপুণ রচনা সত্ত্বেও অবশেষে এই নিষ্ঠাবান ও অধ্যবসায়ী কবি সংযত স্নিগ্ধ কবিকর্মে পৌঁছেছেন। ত্রুটিগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর সাফল্য বিচার করা দরকার, সে-সাফল্য সামান্য নয়। খুব কম কবিই সহজে নিজেকে আবিষ্কার করতে পারেন। উপনিষৎ বলেছেন 'আত্মানং বিদ্ধি', কিন্তু তার চেয়ে দুরূহ আর কোন্ কাজ? ইংরেজিতে যাকে বলে coming into one's own, সেই সুকঠিন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় দীর্ঘ অতন্দ্র সাধনার প্রয়োজন। সাধারণ গৌণ কবি কখনই স্বপ্রতিষ্ঠ হন না, সৎ গৌণ কবির সাফল্য মহৎ না হ'লেও স্বকীয়। দিনেশ দাস, আমার বিবেচনায় সৎ কবি, তাঁর সাফল্য স্বকীয়। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি', খুব যেন মামুলি কথা, কিন্তু অতি সত্য কথা। কবিতা লেখার উত্তেজনায় অনেকেরই চিত্ত আলোড়িত হয়। ছাত্রাবস্থায় জনৈক স্বনামধন্য শিক্ষককে বলতে শুনেছি, যেমন সব শিশুই একবার হামে ভোগে তেমনি সব বাঙালী যুবক (আজকাল যুবতীও) কিছুদিন কবিতা রচনায় লিপ্ত হয়। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের সুমহতী প্রতিভা ও সিন্ধি বাঙালীর স্বভাবত সুকুমার চিত্তে যে-প্রবল

অনুরণন জাগিয়েছে তার ফলে অসংখ্য কবিতার উৎপত্তি আদৌ বিস্ময়কর নয়। গত পঁচিশ বছর বাঙলা দেশে নানা পত্রিকায় সর্বসাকুল্যে যতগুলি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, যতজন কবি আবির্ভূত হয়েছেন, তার মধ্যে কতগুলি কবিতা স্বকীয়তাসম্পন্ন, কতজন কবি আত্ম-প্রকাশের বিনিদ্র তাড়নায় লিখেই চলেছেন তার এক আদমশুমারি থেকে সম্ভবত একথাই প্রমাণ হবে যে বাঙলাদেশের অধিকাংশ কবিই গৌণ কবি আর তাঁদের মধ্যে সৎ কবির সংখ্যা কম।

গৌণ কবির সংখ্যাধিক্য আমার ধারণায় শোচনীয় নয়। যদিচ কবির নিজের পক্ষে গৌণতার ধূসর ছায়ায় মণ্ডিত হওয়া খুব সুখকর না হ'তে পারে, ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে কবির সংখ্যাধিক্য নিশ্চয় জাতির চিত্তসৌকুমার্যের পরিচায়ক। তা' ছাড়া কোনো যুগের সাহিত্যিক মানস—আর জাতিমানসের বিশিষ্ট প্রকাশ সাহিত্যিক মানসে—যত স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় গৌণ সাহিত্যে, মুখ্য সাহিত্যে সে-রকমটি হয় না কেননা গৌণকবি যুগবশ, মুখ্যকবি যুগোত্তীর্ণ। তিরিশের ও চল্লিশের দশকে আমরা বাঙালীরা যে-ভাবনা ও আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেজিত ছিলাম, বাক্‌ভঙ্গীর যে সব বিশেষ সাময়িক রূপ তখনকার দিনে চলতি ছিল, সে-ভাবনার সে-রূপের শিলীভূত প্রকাশ গৌণকাব্যে। এ-কারণে গৌণকাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য অনেক। কাব্যভাষা যদি আমাদের বিচার্য হয় তা'হলে রবীন্দ্রোত্তর মুখ্য কবিদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু সবচেয়ে বেশি ট্র্যাডিশন্-পন্থী, জীবনানন্দ সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সব চেয়ে বেশি অভিনব। তিরিশ ও চল্লিশের দশকে অন্য অগ্রণী কবির মতো দিনেশ দাস এঁদের সাক্‌রেদি করেছেন, কিছু বিষ্ণু দে-র ছায়াও লক্ষ্য করা যায় তাঁর লেখায়। নানাপ্রকার সমকালীন রাজনৈতিক ভাবনা ও বিশ্বাস উত্তীর্ণ হয়ে দিনেশ দাস এখন পূর্ণতাভিসারী এমন স্তরে পৌঁছেছেন ব'লে মনে হয় যেখানে কাব্যবস্তুর জন্য তাঁকে অনুসরণ বা প্রভাবের মায়ামুগ্ধ হতে হয় না, সে-কাব্যবস্তু এখন আপন প্রতীতি থেকেই উৎসারিত, আর কাব্যের অঙ্গসজ্জাতেও তিনি আর সাকরেদ্ নন, তাঁর কবিতায় তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকেরই ছাপ। সে-কারণে সমসাময়িক অসংখ্য গৌণ কবিদের মধ্যে দিনেশ দাস স্মরণীয় সৎ কবি। আমার বিশ্বাস তাঁর কবিতা আরো স্মরণীয় হ'তে পারে যদি কাব্যকলায় তাঁর নিপুণতা তীক্ষ্ণধী হয়, যদি তাঁর গঠন কারুতে দৃঢ়বিবেকী মনঃশক্তির সংযোগ ঘটে। আমি বলছিনে যে তাঁর কাব্যবস্তু হোক দার্শনিক অথবা তত্ত্ববহুল। কবি লিখবেন আপন প্রত্যয় থেকে কিন্তু সে-প্রত্যয়ের সার্থক শিল্পায়ন, তার গঠনকারু, তার ভাষা তার বাক্‌প্রতিমা তার ছাঁদ তার বুনট সতর্ক মননক্রিয়ায় নির্ভরশীল।

সিদ্ধির যে-স্তরে দিনেশ দাস পৌঁছেছেন সেখানে সুমতি সহজ নিবিড় অনুভূতির সঙ্গে মিলেছে প্রায়-নিরাভরণ আন্তরিক উক্তি :

শুধু বৃষ্টির স্বর, সৃষ্টির আদি স্বর
ঝরঝর, ঝরঝর
নেই নেই, খেই তার নেই :
শুধু বৃষ্টি, শুধু জল
ফেঁপে ওঠে, ফুলে ওঠে অঢেল অতল।
সেই জলে এসে
আমার পৃথিবী দেখি সারাদিন মোট ব'য়ে
ডুব দিল শেষে। (৮৪ পৃঃ)

সে-আলোয় তোমারই তো নাম—
তোমারই নামেতে দেখি আলো হয়।

* * *

তোমার বৈশাখী আলো
শুভ্র স্ফটিকের মত জ্বলে
জলে, স্থলে,
সমুদ্রে, আকাশে, শালবনে :
বাইশে শ্রাবণে। (৮২ পৃঃ)

তোমার ছন্দের নদী জমা হ'ত যদি
পৃথিবীতে হ'ত মহাসমুদ্র-বলয়,
ঝুরঝুরে গানের মাটি জ'মে জ'মে হ'ত
আর-এক নতুন হিমালয়!
আকাশে বরুণে দূর স্ফটিক ফেনায়
ছড়ানো তোমার প্রিয়নাম,
তোমার পায়ের পাতা সবখানে পাতা
কোন্‌খানে রাখব প্রণাম! (৫৭ পৃঃ)

এ-উদ্ধৃতি কয়টিতে যে-সুর বেজেছে, যে-প্রতীতির প্রকাশ, সেটাই দিনেশ দাসের উজ্জ্বলতম সিদ্ধি। তাঁর কাব্যে সুরবৈচিত্র্য বেশি নেই। একদা সমসাময়িক 'পরিস্থিতি'র উত্তেজনায় (সে-উত্তেজনায় সেদিনের সব কবিই যোগ দিয়েছিলেন এবং সমসময়ের ডাকে সাড়া দেওয়া কিছু দোষাবহ নয়) তিনি কয়েকটি তৎকালে প্রশংসিত কবিতা লিখেছিলেন 'ভুখ-মিছিল', 'বামপথ', 'নতুন মানুষ' কিন্তু আমার বিবেচনায় এগুলি নয় তাঁর কবিত্বশক্তির নিকটতম প্রকাশ। যদিচ 'কাস্তে' কবিতাটি প্রসিদ্ধতর কোনো কোনো কবিকে অনুরূপ কবিতা লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছিল আর যদি চ অহল্যা-প্রতীকে জীবনানন্দ দাশ দেখতে পেয়েছিলেন অপূর্ব চেতনা, প্রতীকী কাব্যেও দিনেশ দাসের স্বভাব সম্মত নয়। প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁর কবিতায় দেখেছেন অতলতার ইঙ্গিত সর্বত্র বর্তমান। আশঙ্কা হয় এসব কথা স্নেহজাত অতিশয়োক্তি। দিনেশ দাসের কবিচেতনায় আমি অতলতা দেখতে পাইনে আদৌ, বরং দেখতে পাই শিশির বিন্দুর টল্‌টলে সীমিততল।

তবু জানি অন্যপথ, হয়তো তৃতীয় পথ আছে,
তৃতীয় পৃথিবী আছে—আশা, শান্তি, সবুজ শিশির! (৭৬ পৃঃ)

কবির প্রত্যয় কোনো মস্ত দাবী পেশ করে না, উৎকীর্ণ নয় কোনো জটিল তাত্ত্বিক জীবন-জিজ্ঞাসায়, স্বল্প-পরিসর তার ভাবনা আর

আমাদের মন
দু'খানি ইঁটের ফাঁকে
ঘাসের মতন
জেগে থাকে,
নড়ে চড়ে
বসন্তের সবুজ প্রহরে। (৭৪ পৃঃ)

এই অনুচ্চাকাঙ্ক্ষী, স্বল্প পরিসর অথচ একান্তই অন্তরঙ্গ ভাবনার সুর দিনেশ দাসের কবিতায় প্রথম থেকেই উপস্থিত, 'প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা', 'মৌমাছি' প্রভৃতি থেকে শুরু হ'য়ে 'ঘুঘু ডাকে', 'পশ্চিমে বৈশাখ', 'পুনর্জন্ম', 'আচার্য বিনোবা ভাবে', 'বসন্তের সবুজ প্রহরে' প্রভৃতি সিগ্ধিধন্য কবিতাগুলিতে একই নম্র স্নিগ্ধ সুর। রোদ্দুরে ঘুরছে একটি চড়াই, সামনে একটি শামুক, কচি কলাপাতার রং, হাজার ছেলের হাত ধ'রে বীজধানের ফিরে আসা, দুপুর রোদে পাথরে কঙ্করে জন্তু-দিবসের একলা খেলা, ধানের হলুদ শিষ—এ-সমস্ত অনুদাও নম্র বস্তুতে দিনেশ দাসের সুন্দরতম বাক্‌প্রতিমা, তাঁর কল্পনার সহজতম প্রকাশ।

বুদ্ধির বিন্ধ্যগিরি পার হ'লে পরে,
হঠাৎ
দেখবে তুমি হৃদয়ের জলপ্রপাত। (৬৩ পৃঃ)

হৃদয়-নির্ভর কবি দিনেশ দাস, তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা"য় হৃদয় শব্দটি যে সব চেয়ে বেশিবার প্রযুক্ত হয়েছে তা' নিরর্থক নয়। খানিকটা জীবনানন্দের ঢঙে হৃদয়বাদী দিনেশ দাসের কল্প-জগৎ যেন এক আলো-আঁধারী ধূসরতায় ছাওয়া। দু' জোড়া দ্বিরুক্ত শব্দ 'আলো-আলো' 'ছায়া-ছায়া' বহুবার পাচ্ছি তাঁর শেষ দিককার রচনায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

তুমি তো ঝড়ের রাত্রি—সমুদ্রের আলো-আলো দিন (৫৬ পৃঃ)
সকালের আলো-আলো হলুদ রোদ্দুরে (৫১ পৃঃ)
একটি প্রাচীন গাছ চোখ মেলে চায়,
আলো-আলো জলের ছায়ায় (৬০ পৃঃ)
তোমাকে দেখায় যেন আলো-আলো সবুজ-সবুজ (৩৩ পৃঃ)
আলো-আলো চোখ তার হঠাৎ-আলোর মত জাগে (৮৫ পৃঃ)

ছায়া-ছায়া অন্ধকারে তুমি-আমি ছায়াময়-ছায়াময়ী ঘুরি (৬২ পৃঃ)
ছায়া-ছায়া অন্ধকার ধূসর অথই (৬২ পৃঃ)
ছায়া-ছায়া দিন (৭১ পৃঃ)
ছায়া-ছায়া বৈকালে জল ঝিরঝির (৮৩ পৃঃ)
ছায়া নয়, ছায়া-ছায়া লাগে,
আলো-আলো চোখ তার হঠাৎ-আলোর মত জাগে (৮৫ পৃঃ)

এসব দ্বিরুক্ত শব্দ ছাড়া একাকী 'আলো' এবং 'ছায়া' শব্দ দুটি বহুবার প্রযুক্ত হয়েছে। এসব শব্দ-দ্বিরুক্তি শব্দ-সম্পদের সাক্ষ্য ব'লে আমার মনে হয় না কিন্তু এসব শব্দে কবি কল্পনার একটি বিশেষ রূপ প্রতিভাত হয়েছে ব'লে আমার বিশ্বাস। তিনি বিশেষ একটি আলো-রূপ অথবা বলা যেতে পারে আলো-ছায়া-রূপ প্রত্যক্ষ করছেন। কোনো কোনো কবির কল্পজগৎ আলোক-প্রতিমায় সংহত। শেলির কবিতায় একটা অপার্থিব উদ্ভাস, টেনিসনে আবছায়া প্রত্যুষ অথবা সন্ধ্যা, ব্রাউনিংয়ে মাধ্যন্দিন প্রখর রৌদ্র। রবীন্দ্রনাথে কত রকমের আলো, আর এত রকমারির মধ্যে কোন্ বিশেষ আলোক-প্রতিমা তাঁর কবিসত্তার অন্তরঙ্গতম প্রতিভাস সে-বৃত্তান্ত সতর্ক আলোচনার অপেক্ষাথর্ী। জীবনানন্দ দাশে ও বুদ্ধদেব বসুতে আলোক-প্রতিমা কোনো সহৃদয় পাঠকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। দিনেশ দাস গৌণ কবি কিন্তু তাঁর সৃজনীশক্তিও নিয়ত আলোক-সন্ধানী, সে-আলোক শুভ্র আলোক নয় সব সময়, বরং তাঁর কাব্য যত এগিয়েছে পরিণতির পথে, তাঁর আত্মোপলব্ধি যত নিশ্চয়তর

হয়েছে আর কবি হিসেবে তিনি হয়েছেন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠ, ততই তিনি সুস্পষ্ট আলো ও ঘন অন্ধকার ছেড়ে দিয়ে আঁকড়ে ধরেছেন আলো-আঁধারের ধূসরতাকে। সে-ধূসরতা যেন তাঁর শুদ্ধ হৃদয়বিদ্ সংযত শান্ত স্নিগ্ধ নম্র কবিচিত্তের যথার্থ বর্ণপ্রতিমা।*

অমলেন্দু বসু

* দিনেশ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা। লেখক সমবায়। কলিকাতা, ৯। মূল্য ৩·৫০ ন. প.

সমালোচনা

রুবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম—অনুবাদ : কাজী নজরুল ইসলাম। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। কলিকাতা, ১২। মূল্য দশ টাকা।

তিরিশ বছর আগের কথা। বাংলার কাব্যাকাশে কাজী নজরুল ইসলাম তখন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রচনার মৌলিকতায় তাঁর কবিখ্যাতি দেশবিস্তৃত। অনুবাদের কাজে তখনও হাত দেন নি। প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর "হাফিজের রুবাইয়াৎ"। এরপর ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ অনুবাদ করতে শুরু করেন। সাময়িক পত্র পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু বাংলাভাষায় ইতোমধ্যে ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎগুলির তিন-তিনখানি অনুবাদগ্রন্থ পরপর প্রকাশিত হয়ে যায়। তবে, সেগুলি মূল ফার্সী থেকে অনুবাদ নয়। ইংরেজ কবি ফিটাজিরাল্ড, হুইনফিল্ড, ট্যালবট, পেইন প্রভৃতির ইংরেজী অনুবাদ থেকে বাংলা করা। অনুবাদগুলি জনপ্রিয় হয়ে ওঠায় নজরুল আর নিজের অনুবাদগুলি সে-সময় গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন নি।

এতকাল পরে কাজীর অনূদিত সেই ওমর খৈয়ামের রুবাইৎগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে প্রকাশক আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তবে, নজরুল এখন সুস্থ থাকলে খুশী হতেন কিনা সেকথা হলফ করে বলা যায় না। কাজীর ফার্সী কবিতা অনুবাদের বিশেষত্ব দেখেছিলেম যথাসম্ভব মূল রুবাইগুলির রূপ অক্ষুন্ন রাখা। ইরানের আবহাওয়া যাতে অনেকখানি বজায় থাকে। এ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু, ভিন্ন দেশের পট-ভূমিকায়, বিভিন্ন ভাষার অন্দরে, ভিন্ন সামাজিক পরিবেশের মজলিসে এরকম দুরূহ ও দুঃসাহসিক অভিযান কতটা সার্থক হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যায় কি?

সৈয়দ মুজতবা আলী যে মূল্যবান ভূমিকা রচনা করে দিয়ে কাজী নজরুল ইসলামের এই গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন, তার মধ্যে দেখা যায় তিনিও এসংশয় থেকে মুক্ত নন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, 'কাব্যে যদ্যপি 'থাকী' এবং 'সাকী' চমৎকার মিল, তবু বাস্তবজীবনে এ দুটোর মিল এবং মিলন সচরাচর হয় না।...কাজী রোমাণ্টিক কবি। বাংলাদেশের জল-বাতাস বাঁশ ঘাস যে রকম তাঁকে বাস্তব থেকে স্বপ্নলোকে নিয়ে যেত, ঠিক তেমনি ইরান তুরানের স্বপ্নভূমিকে তিনি বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে...ইরানী সাকীর গলায় কবি যে বারবার শিউলীর মালা পরিয়ে দিচ্ছেন, তার কারণ সে...ইরানী বিদ্রোহী কবিদের নর্মসহচরী বলে।'

এ বিষয়ে আলী সাহেবের সঙ্গে আমিও একমত। আমার বিশ্বাস যে-কোনও ভাষারই কবিতা হোক না কেন তার অবিকল ভাষান্তর প্রায় অসম্ভব। কবিতার মর্মকথার আভাসটুকু গদ্য অনুবাদে হয়ত কিছুটা দেওয়া যায়। কিন্তু ভাষান্তরিত কাব্যানুবাদের মাধ্যমে তার সজীবতার স্পর্শ ও প্রকৃত সুষমাটুকু ফুটিয়ে তোলা যায় না। আরও মুস্কিল হয়, যদি বিদেশী কবিতার নিজস্ব ছন্দ মিল প্রভৃতি বহিরঙ্গকে আমরা আঁকড়ে থাকতে চাই। সে বাঁধাবাঁধির নাগপাশে আড়ষ্ট অনুবাদে কাব্যের আসল সৌন্দর্য অক্ষুন্ন রাখা দুঃসাধ্য।

ফিটজিয়্যাল্ড নিজে কবি ছিলেন। ফার্সী রুবাইয়াতের চতুষ্পদী রূপ ও তার বিশেষত্ব বজায় রাখতে গিয়ে তাঁকে আক্ষরিক অনুবাদ পরিহার করে ভাবানুবাদের দিকেই ঝুঁকতে হয়েছিল। এর ফলে তাঁর অনুবাদ হয়ে উঠেছিল আর এক নূতন সৃষ্টি। সুতরাং ওমর খৈয়ামের রচনার মধ্যে যেটুকু কাব্যাংশ ছিল তাঁর অনুবাদে সে দিকটা আহত হয় নি।

ফিটজিয়্যাল্ডের অনূদিত কয়েকটি রুবাই সর্বপ্রথম বাংলার অনুবাদ করেছিলেন প্রখ্যাত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি অনুবাদে চতুষ্পদীর সীমা লঙ্ঘন না করলেও রুবাইয়াতের বিশেষত্বকে ততটা আমল দেন নি। এরপর কান্তিচন্দ্র ঘোষ ফিটজিয়াল্ডের অনূদিত প্রথম সংস্করণ ওমর খৈয়ামের ৭৫টি রুবাই বাংলায় অনুবাদ করেন। এ অনুবাদে তিনি ফিটজিয়াল্ডের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ সবিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কারণ রুবাই ছন্দের সাবলীল ধ্বনি তাঁর সুললিত ব্যঞ্জনার গুণে মনের সঙ্গে কানকেও খুশির আরাম দিতে পেরেছিল। কোথাও অনুবাদের আড়ষ্টতা পাঠকের রসভঙ্গের কারণ ঘটায়নি। কবি হেমেন্দ্রকুমার রায়ও ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের বাংলা অনুবাদ ফিটজিয়্যাল্ড অবলম্বনেই করেছিলেন। রুবাইগুলির ছন্দ-বৈশিষ্ট্য তিনি কতকটা অক্ষুণ্ণ রাখলেও তার ইরানী রূপ বর্জন করে সেগুলিকে একেবারে ভারতীয় করে তুলেছিলেন।

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলায় 'বিদ্রোহী কবি' বলে আখ্যাত ছিলেন। ওমরের জীবন-দর্শন তাঁর বন্ধনহীন বেপরোয়া মনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। ফার্সী ভাষায় 'পণ্ডিত' না হলেও তিনি ইরানের কাব্যকুঞ্জের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। সে দেশের গজল কসীদার সুর তাঁকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। দিলরুবার ঝংকার তাঁর অন্তরে পারশ্য সাগরের শিহরণ আনতো। ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ বাংলায় অনুবাদ করবার জন্য ফিটজিয়্যাল্ডের কাছে তাঁকে ঋণ স্বীকার করতে হয়নি।. ওমরের মূল রুবাইগুলির ১৯৩টি একদা বাংলার অনুবাদ করেছিলেন তিনি। ছন্দে তাঁর দক্ষতা ছিল। তাই ওমর খৈয়ামের রুবাইগুলি তাঁর নিপুণ হাতে স্থানে স্থানে ফার্সী জোব্বা পরেই বাংলায় এসেছে।

এই ফার্সী চতুষ্পদী রুবাইগুলিতে প্রথম দুটি পদের অন্তে মিল আছে। তৃতীয় পদে গরমিল। কিন্তু, চতুর্থ পদটি আবার প্রথম ও দ্বিতীয় মিলনান্ত পদেরই অনুবর্তী। ফার্সী কবিতা বেশির ভাগই ইঙ্গিত-ধর্মী। ভাবের প্রকাশ এতে দেখা যায় প্রায় রূপকের সাহায্যে। ছন্দোবদ্ধ রুবাইয়ের সীমিত স্বল্পতায় তার প্রগাঢ়তার নিবিড় পরিচয় পাওয়া যায়। রুবাই-গুলির মধ্যে কোনও নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক ক্রমবিকাশ থাকে না। এই চতুষ্পদী-গুলির মধ্যে কবি মনের বিভিন্ন অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা ও ভাবের নক্ষত্রগুলি আপন আপন মৃদুপ্রভা ও উজ্জ্বলতা নিয়ে পাশাপাশি ফুটে থাকে। তাঁদের সমগ্র জীবন-দর্শনের গভীর গূঢ় তত্ত্ববাণীই শুধু নয়, অলস বিলাসের অবসর ক্ষণে ভেসে আসা নানা অসংলগ্ন এলোমেলো ভাবনাও উঁকি মারে এই রুবাইগুলির মধ্যে।

ওমর খৈয়াম কবি ছিলেন না। কবিখ্যাতিও পাননি তাঁর জীবদ্দশায়। পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল বটে দেশজোড়া। একজন চিন্তাশীল মনীষী বলেও তাঁর সুনাম ছিল চারিদিকে বিস্তৃত। দর্শন বিজ্ঞান গণিত ও জ্যোতিষে তাঁর অধিকার ছিল অসাধারণ। বিশ্ববিশ্রুত আবুসেনার পর বোধ করি জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বলে ইনিই দূরপ্রসারী স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। যদিও নীতিবাগীশদের কাছে নাস্তিক, চরিত্রহীন, মাতাল বলে দুর্নামও বড় কম রটেনি।

এঁর আবির্ভাব তিথির কোনও নির্ভুল হদিস মেলে না। তিরোভাবের তারিখটিও

তর্কাতীত নয়। নানা পাঁজির নানা মত। পৃথিবীর কোনও মহৎ কবিরই জন্মমৃত্যুর সন তারিখ পঞ্জিকার মুখাপেক্ষী হয় না। তাঁদের জন্মক্ষণের শুভশঙ্খ ধ্বনিত হয় প্রথম কাব্য-সৃষ্টির জয়-লগ্নে। তাঁদের মৃত্যুর খবর খুঁজে পাওয়া যায় না চিত্রগুপ্তের খাতার পাতে। ঐতিহাসিকের এজন্য আক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু কাব্যরসিকদের কাছে কবি শাশ্বত কালের।

কর্মক্লান্ত ওমর মাঝে মাঝে যখন কাজ বন্ধ রেখে গণিতের জটিল জঞ্জালগুলো ভুলে থাকতে চাইতেন, দর্শনের অদৃশ্য ভূতগুলো তখন নিঃশব্দে এসে তাঁর ঘাড়ে চেপে বসতো। কত কি উদ্ভট এলোমেলো ভাবনা আনাগোনা করতো তাঁর সুর ও সুরার নেশায় মশগুল মগজের মধ্যে। সেই এলোমেলো চিন্তাগুলিকে খৈয়াম তাঁর খেয়ালের খাতায় কখনো কখনো মর্জি মাফিক টুকে রাখতেন। সংক্ষিপ্ত চার লাইন মাত্র রুবাইয়ের মধ্যেই অমর অক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে ওমরের কত যে বিশ্বস্তুত দর্শন তত্ত্ব, জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র মর্মকথা তার সীমা পরিসীমা নেই। এই মনীষীর মনোতটে ভাব-সাগরের কত যে বিচিত্র ঢেউ এসে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে, কতরকম দিব্য-জ্যোতির বর্ণপ্রভা তাঁর অবকাশের আকাশকে রঙীন করে তুলেছে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায় এই রুবাইগুলিতে।

বাংলার ছেলে কাজী নজরুল। চুরুলিয়ার 'চারণ-কবি'। বিদ্রোহী তাঁর আত্মা। তাঁর মন ছুটে যায় ইরানের বুকে। খোরাসানের গুলিস্তানে। নার্গিসের ফুল-বাগিচায়। বুলবুলের শিসে তাঁর রোমাঞ্চ হয়। বেল, যুঁই, চাঁপার সঙ্গে হেনার মদির সুরভিও তাঁকে আকুল করে তোলে। তাই পারস্য-প্রসূনে ঘেরা দ্রাক্ষা-কুঞ্জে তাঁর উদভ্রান্ত মন গিয়ে হাজির হলেও সেটা তাঁর পক্ষে অনধিকার প্রবেশ বলে কেউ ফতোয়া জারি করবেন না নিশ্চয়। মক্ষিকাধর্মী হয়ে তাঁর ত্রুটি বিচ্যুতির বিচার করতে না বসে বরং ভ্রমর-সুলভ বৃত্তিতে মধুরসের আস্বাদ নিয়ে কবি প্রয়াসের তারিফ করবেন—বাহবা দেবেন।

ওমর খৈয়ামের রুবাইগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে অনেক। কতকগুলি রুবাইয়ে দেখা যায় কেবল সুরা ও সাকীর উচ্ছ্বসিত বন্দনা। কোনো কোনো ধর্ম ভীরু ওমরভক্ত সেগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়ে ওমরের ইজ্জত বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। দু-একটি রুবাইয়ের অবশ্য গূঢ় অর্থ বিচার করে, অনেক টেনেটুনে—হয়ত সাকীকে গুরুর প্রতীক আর সুরাকে তত্ত্বজ্ঞান বলে খাড়া করা যায়। কিন্তু, সবগুলিকেই দরবেশের আলখাল্লা পরিয়ে সাধু করে তোলবার কোনও উপায়ই রাখেন নি তিনি। সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেবও তাঁর ভূমিকায় একথা স্বীকার করেছেন।

তবে, একথাও না মেনে উপায় নেই যে সুরাই বলুন আর সাকীই বলুন, শুঁড়িখানার পানশালাই বলুন আর বারাঙ্গনার জলসাঘরই বলুন, ওমর খৈয়ামের প্রত্যেকটি রুবাই যেন হীরে মতি মরকতের ফুলঝুরি। জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের দীপ্ত চেকনাই যেন ক্ষণে ক্ষণে বিজলি-চমকের মতো ঠিকরে উঠছে এই কাব্যকণিকার টুকরোগুলিতে।

'আমার আজের রাতের খোরাক তোর টুকটুক শীরীন ঠোঁটি,
গজল শোনাও, শিরাজী দাও, তন্বী সাকী জেগে ওঠ।
লাজ-রাঙা তোর গালের মতো দে গোলাপী রঙ শরাব,
মনে ব্যথার বিনুনী মোর—খোঁপায় যেমন তোর চুনোট!'

* * *

'রহস্য শোন্ সেই সে লোকের আত্মা যেথায় বিরাজে
ওরে মানব নিখিল সৃষ্টি লুকিয়ে আছে তোর মাঝে।

তুই তো মানুষ, তুইই পশু, দেবতা, দানব, স্বর্গদূত
যখন হতে চাইবিরে যা' হতে পারিস তুই তা যে।'

শুধু সুরা আর সাকী নিয়েই মেতে ছিলেন না ওমর। প্রেমের পরম প্রকাশও দেখতে পাই তাঁর অনেকগুলি রুবাইয়ের মধ্যে। বিরহের দুঃখ, মিলনের আকাঙ্ক্ষা, প্রিয় সন্দর্শনের ব্যাকুলতা, অদর্শনের বেদনা, প্রণয়ের প্রভাব, প্রেমের সার্থকতা প্রভৃতি মানব মনের সকল অবস্থার ছবিই এতে প্রতিফলিত হয়েছে—

'মুগ্ধ করো শিথিল হৃদয় প্রেম-নিবেদন কৌশলে,
হৃদয়জয়ী হে বীর, উড়াও নিশান প্রিয়ার অঞ্চলে।
এক হৃদয়ের সমান নহে লক্ষ মসজিদ আর কাবা—
কী হবে তোর তীর্থে 'কাবার' শান্তি খোঁজ হৃদয় তলে।'

* * *

'হৃদয় যাদের অমর প্রেমের জ্যোতির্ধারায় দীপ্তিমান,
মসজিদ মন্দির গির্জা যথাই করুক অর্ঘ্য দান
প্রেমের খাতায় থাকে লেখা অমর হয়ে তাদের নাম,
স্বর্গের লোভ, নরক ভীতির ঊর্ধ্বে তারা মুক্ত প্রাণ।'

স্রষ্টার বিরুদ্ধে কবির অভিযোগেরও অন্ত নেই। কত যে তাঁর অবিচার, নিয়তির চক্র নিয়ত দুর্বার, অদৃষ্টের বিধি অপরিহার্য, মানুষের শক্তি নিতান্ত সীমাবদ্ধ, জীবন ক্ষণভঙ্গুর ইত্যাদি অভিমতও প্রকাশ পেয়েছে অনেকগুলি রুবাইয়ে—

'আমরা দাবা খেলার ঘুঁটি, নাইরে এতে সন্দ নাই,
আসমানী সেই রাজদাবাড়ে চালায় যেমন চলছি তাই।
এই জীবনের দাবার ছকে সামনে পিছে ছুটবি সব,
খেলার শেষে তুলে মোদের রাখবে মৃত্যু বাক্সে ভাই।'

* * *

'আসিনিত হেথায় আমি আপন স্বাধীন ইচ্ছাতে
যাবও না নিজ ইচ্ছা মতো, খেলার পুতুল তাঁর হাতে।'

* * *

'খৈয়াম! তোর দিন-দুয়েকের এই যে দেহের শামিয়ানা,
আত্মা নামক শাহনশাহের হেথায় ক্ষণিক আস্তানা।'

* * *

'খ্যাতির মুকুট পরলে হেথায় নিন্দা গ্লানির পাঁক হানে,
বলবে ষড়যন্ত্রকারী রোস্ যদি গোরোস্থানে।'

মাঝে মাঝে কঠিন বিদ্রূপও করেছেন কবি তাঁর রুবাইগুলিতে মানুষের ভণ্ডামীর জন্য, তার নির্বুদ্ধিতার জন্য, তার যুক্তিহীন অন্ধ অবিশ্বাসের জন্য, তার গোড়ামির নির্লজ্জ স্পর্ধার জন্য—

'স্বর্গে পাবো শরাব সুধা—এযে কড়ার খোদ খোদার
ধরায় তাহা পান করলে পাপ হয় এ কোন বিচার?'

* * *

'ভণ্ড যত ভড়ং করে দেখিয়ে বেড়ায় জায়নামাজ,

চায়না খোদায়, লোকের তারা প্রশংসা চায়, ধাপ্পাবাজ!
দিব্যি আছে মুখোস পরে সাধু, ফকীর ধার্মিকের,
ভিতরে সব কাফের ওরা, বাইরে মুসলমানের সাজ!'

* * *

'পানোন্মত্ত বারাঙ্গনায় দেখে সে এক কাজী কন—
'দুরাচার আর সুরার করো দাসীপণা সর্বক্ষণ!'
'আমায় দেখে যা মনে হয় তাই আমি' কয় বারনারী
'কিন্তু শেখজী! তুমি কি তাই, তোমায় দেখে কয় যা মন?'

আবার—প্রকৃতির শোভা, সৃষ্টির সৌন্দর্য, প্রভাতের প্রশান্ত আকাশ, গোধূলির সোনার আলো, বসন্তের রূপমাধুরী, বুলবুলির গান, গোলাপের সৌরভ, নিভৃত নদীতীরের নির্জন তরুতল, জ্যোৎস্নালোকিত নিকুঞ্জের বনশ্রী, তরুণী রূপসীর লাবণ্যময় তনুপ্রভা, এ সবের প্রচুর সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায় অনেকগুলি রুবাইয়ে—

'নীল আকাশের নয়ন ছেপে বাদল অশ্রু জল ঝরে
না-পেলে আজ এই পানীয় ফুটতোনা ফুল বন ভরে।'

* * *

'মধুর গোলাপ বালার গালে দখিন হাওয়ার মদির শ্বাস,
মধুর তোমার রূপের কুহক মাতায় যা এই পুষ্পাবাস।'

* * *

'নৃত্য পাগল ঝর্ণাতীরে সবুজ ঘাসের ঐ ঝালর
উন্মুখ কার চুমো যেন দেবকুমারের ঠোঁটের পর।'

* * *

'শীত ঋতু ওই হল গত, বইছে বায় বসন্তের,
জীবন পুঁথির পাতাগুলো পড়বে ঝরি নাই দেরী।'

* * *

'বুলবুলি এক হাল্কা পাখায় উড়ে যেতে গুলিস্তান
দেখ্‌ল হাসি খুশি ভরা গোলাপ লিলির ফুল-বাথান।'

* * *

'মানব দেহ—রঙে রূপে এই অপরূপ ঘরখানি,
স্বর্গের সে শিল্পী কেন করলো সৃজন কী জানি?
এই লালামুখ বল্লী তনু ফুল্ল কপোল তন্বীদের
সাজাতে হয় ভঙ্গুর এই মাটির ধরার ফুলদানি।'

কিন্তু, এই রুবাইগুলির মধ্যে প্রধানতঃ দেখতে পাই ওমরের সমস্ত মন বুদ্ধি চেতনা ও চিন্তাকে ওতপ্রোতভাবে আচ্ছন্ন করে আছে—অধ্যাত্মদর্শন, ভাগবততত্ত্ব সৃষ্টিরহস্য, জীবন-বাদ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, জন্ম-মৃত্যুর বিচারবোধ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অধীর অনুসন্ধিৎসা—

'ধরায় প্রথম এলাম নিয়ে বিস্ময় আর কৌতূহল
তারপর এ জীবন দেখি কল্পনা আঁধার অতল।
ইচ্ছা থাক কি না-থাক শেষে যেতেই হবে, তাই বলি—

এই যে জীবন আসা-যাওয়ার আঁধার ধাঁধার জট কেবল।'

* * *

'বলতে পারো অসার শূন্য ভবের হাটের এই ঘরে
জ্ঞান-বিলাসী সুধী জনের হৃদয় কেন রয় পড়ে?
যেই তাহারা শ্রান্ত হয়ে এই সে ঘরের শান্তি চায়,
'সময় হল চল ওরে' কয় অমনি মরণ হাত ধরে।'

* * *

'সকল গোপন তত্ত্ব জেনেও পার্থিব এই আবহাওয়ায়
মিথ্যা ভয়ের ভয় গেল না? নিত্য ভয়ের হও শিকার?
জানি স্বাধীন ইচ্ছা মতো যায় না চলা এই ধরায়,
যতটুকু সময় তবু পাও হাতে লও সুযোগ তার।'

* * *

'ভালো করেই জানি আমি আছে এক রহস্য লোক,
যায় না বলা সকলকে তা' ভালই হোক কি মন্দ হোক।
আমার কথা ধোঁয়ায় ভরা, ভাঙতে তবু পারবো না
থাকি সে কোন গোপন লোকে দেখতে যাহা পায় না চোখ।'

কয়েকটি রুবাইয়ের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন তাঁর সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সর্বজনগ্রাহ্য অমূল্য উপদেশাবলী—

'কারুর প্রাণে দুঃখ দিও না করো বরং হাজার পাপ,
পরের মনের শান্তি নাশি বাড়িও না আর মনস্তাপ।
অমর আশিস লাভের আশা রয় যদি হে বন্ধু মোর,
আপনি সয়ে ব্যথা, মুছো পরের বুকের ব্যথার ছোপ।'

* * *

'আমার কাছে শোন্ উপদেশ—কাউকে কিছু বলিস নে—
মিথ্যা ধরায় কাউকে প্রাণের বন্ধু মেনে চলিস নে।
দুঃখ ব্যথায় টলিসনে তুই, খুঁজিস নে তার প্রতিষেধ,
চাসনে ব্যথার সমব্যথী, শির উঁচু রাখ, ঢলিস নে।'

উদ্ধৃতি সমস্তই কাজী নজরুল ইসলামের অনূদিত ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎগুলির বাংলা রূপ। মূলের সঙ্গে যাঁরা মিলিয়ে দেখবেন তাঁরা এর দোষগুণ বুঝতে পারবেন। যদিও সৈয়দ মুজতবা আলী সাহেব তাঁর ভূমিকায় ওমর খৈয়ামের রুবাইগুলির বাংলা অনুবাদের পরিচয় প্রসঙ্গে কাজীর অনুবাদের পাশে পাশে কান্তিচন্দ্রের অনুবাদ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ এবং নিজের স্বকৃত সুন্দর অনুবাদগুলির সাহায্য নিয়েছেন অনেক বেশি। তার ফলে ভূমিকার অন্তর্গত গ্রন্থ পরিচিতিটুকু অনেকটা তুলনা-মূলক সাহিত্যালোচনার পর্যায়ে গিয়ে পড়েছে। আমি জানি না কোনও লেখকের নিজের ও তাঁর রচনার পরিচয়-প্রসঙ্গে উক্ত লেখকেরই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় অপরাপর লেখকদের সেই একই কবিকর্মের নমুনা উদ্ধৃত করা সমিচীন কিনা? এ অধিকার অবশ্য সমালোচকদের আছে স্বীকার করি, কিন্তু, গ্রন্থের মুখবন্ধকার যদি এ কাজ করেন, তাহলে অনুবাদকের আলোচ্য রচনার প্রতি হয়ত একটু অবিচার হয়ে পড়ে। কারণ, রূপোর খাড়ুর সঙ্গে সোনার বাউটির তুলনা চলে না।

তুলনার তীব্র জলুসে অনেক সময় তুলনেয় বস্তুর দীপ্তি ম্লান হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে সেই দুর্ঘটনাই ঘটেছে বলে ব্যাপারটার উল্লেখ করা কর্তব্য মনে করি। প্রকাশকের একটি অবশ্য করণীয় কাজ ছিল এই গ্রন্থে—প্রকাশকের একটি 'নিবেদন' সংযুক্ত করা। এই অভাবটুকু থাকায় সমালোচকের পক্ষে বেশ একটু অসুবিধার সৃষ্টি করেছে।

নরেন্দ্র দেব

আমাদের শান্তিনিকেতন—সুধীরঞ্জন দাস। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

ছেলেবেলার কথা লেখা ইদানিং যেন বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের জীবনস্মৃতির সম্বন্ধে এই কথা বলেছেন যে, প্রৌঢ় বয়সে ছোটবেলাকার কথা লিখতে গেলে যা যেমনটি ঘটেছিল তেমন আর হয়তো স্মরণ হয় না, ঘটনার পারম্পর্যও ঠিক থাকে না। বর্তমান গ্রন্থকারও তাঁর ভূমিকাতে সেই কথাই বলেছেন। তবু মনের উপর সে সব দিনগুলি যে স্থায়ী ছাপ রেখে যায় তারি উপর নির্ভর করে সব জীবনস্মৃতি লেখা হয়।

মুসকিল হল এই যে, অধিকাংশ স্মৃতিকাররাই নিজেদের সাক্ষীবিহীন ছোটবেলাকার কথা বলতে গিয়ে বর্তমান বয়সের অনেক চিন্তাধারাই সে সময়ের উপর আরোপ করে বসেন। কোন চিন্তাটি যে বয়স্ক লেখকের আর কোনটি যে সেই ছেলেমানুষটির সত্যিকারের মনের কথা তার আর কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। তার চাইতে নিছক ঘটনার উপর নির্ভর করা অনেক বেশি নিরাপদ।

বর্তমান লেখকও তাই করেছেন। অবশ্য কেবল ঘটনা দিয়ে তো আর মানবচরিত হয় না, মনের উপর সেইসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ার কথাও বলতে হয়। এই গ্রন্থে এত সংক্ষেপে, এমনি সরলভাবে, সর্বদা নিজেকে মঞ্চের মধ্যদেশ থেকে আশ্চর্যভাবে সরিয়ে রেখে গ্রন্থকার তাঁর নিজের ছোটবেলার কথা লিখেছেন যে যাঁদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় নেই, তাঁরাই বিস্মিত হবেন।

সেকালের শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের কথাও অনেকেই লিখেছেন। সেখানকার কৃচ্ছ্রসাধনা, সেবাব্রত, কবির কাছে পাঠ নেওয়ার কোনো কথাই আমাদের অজানা নেই। কিন্তু তখনকার আশ্রমের প্রতিদিনের ঘরোয়া জীবনের ছবি এত স্পষ্ট করে কেউ আঁকেন নি। সেই সাধারণ আটপৌরে জীবনের মধ্যে যে কি অসাধারণ অনুপ্রেরণা ছিল তা পাঠকমাত্রেরই বারংবার বিস্ময়ের বস্তু হয়ে ওঠে।

অল্প কটি কথায় তখনকার পরিবেশখানি জীবন্ত হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে বোলপুরের বিদ্যালয়ের কি ধরনের খ্যাতি ছিল তাও বোঝা যায়। সুধীরঞ্জন বোলপুর যাচ্ছেন শুনে তাঁর সোনাদাদা বললেন, 'যাও-না, দেখবে কেমন মজা! কলকাতার কটন ইস্কুলের নাম শুনেছ তো? সেখানে মেরে ছেলেদের তুলোধুনো করে দেয়। সেখানেও তোমার সানাবে না বলে তোমাকে রবি ঠাকুরের ইস্কুলে পাঠানো হচ্ছে—রবি ঠাকুর ঠেঙিয়ে তোমাকে সোজা বানিয়ে দেবেন।'

পরে দেখা গেল রবি ঠাকুরের ঐ সব অধামারা ছেলেগুলোর মধ্যে থেকে কতজনই না দেশের লোকের সম্মান পেয়েছিল। তবে নিয়মকানুন সেখানকার যে সবি উল্টো রকমের ছিল সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই। বই মুখস্থর উপর অন্য জায়গার মতো অত জোর দেওয়া হত না। ছেলেরা যে-সব কাজ করত তার অধিকাংশই অন্য জায়গায় চাকররা করে থাকে। হৈ চৈ, নিয়মের ব্যতিক্রমও প্রায়ই হত। মাস্টার মশাইরা ছেলেদের যত-না শাসন করতেন, ভালোবাসতেন তার চাইতে ঢের বেশি। মারধোর বারণ ছিল। আর সব-কিছুর পিছনে ছিল কবির অনুপ্রেরণা।

জীবনটা থেকে অবান্তর যা-কিছু সব ছেঁটে ফেলে দিয়ে রবি ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত বিদ্যালয়ে, কেবল যা দিয়ে ছোট ছেলেরা বড় মানুষ হতে পারে তারি চেষ্টা চলত। মাস্টার মশাইরাও শুধু বড় বড় ডিগ্রীধারী মাইনে-করা পড়াবার লোক ছিলেন না; পড়ানো ছিল তাঁদের জীবনের একমাত্র সাধনা। পড়ানো বলতে শুধু বই পড়ানোই বোঝাত না, মনের চাবি খুলে দেবার জন্যে যা-কিছু করতে হয় সব-কিছুই ঐ পড়ানোর মধ্যে স্থান পেত।

গানবাজনা, গল্প, অভিনয়, দেশ দেখা, উন্মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে ঘুরে বেড়ানো, আশ্রমের পরিচর্যা—কোনো কিছুই বাদ যেত না। সৌখীনতার কোনো স্থান ছিল না, তবে তার অভাববোধেরও এতটুকু অবকাশ থাকত না।

ছাত্রদের জন্যে কবি যে অনাড়ম্বর সরল জীবনযাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন, তার মধ্যে শরীরকে পীড়া দিয়ে মনকে শাসনে আনার অভিপ্রায় আদৌ ছিল না। বরং তিনি তার যে বিরোধী ছিলেন, এই গ্রন্থে বহু স্থানে তারো নির্দেশ পাওয়া যায়।

ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কবি অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু সব জেনে শুনে ছেলেদের যে দিশী পথ ধরতে হবে এই ছিল তাঁর ইচ্ছা—এ কথারো প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোনো প্রসঙ্গে এতটুকু পাণ্ডিত্যয়ানা না করে, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার গৌরবময় আদর্শের এমন চিত্র আর কখনো আমাদের চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না।

গ্রন্থকার বইখানি শেষ করছেন এই বলে, 'সেই আশ্রম যখন ছেড়ে এলাম তখন হৃদয়-তন্ত্রীতে খুবই টান পড়েছিল...আশ্রমের আকাশ বাতাস আলো, পরিচিত তরুলতা যা আমাদের সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল, তারা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে পিছু ডেকেছিল।...পরে জেনেছি, আশ্রমজননী তো আমাকে ছাড়লেন না, এখনো নিত্য টানেন তাঁর স্নেহময় ক্রোড়ে।'

যে বই পড়া হয়ে গেলেই ফুরিয়ে যায় তার গুণে কোথাও ঘাটতি আছে। কিন্তু যে বই পড়ে মনের মাঝে একটা ছোট বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে, তার শিকড় পৃথিবীর বুকের ভিতর নামতে থাকে, তার ডালপালা আকাশে নিজেদের মেলে দেয়, সেই হল শ্রেষ্ঠ বই।

এ বইও সেই জাতের বই। পড়লে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা পদ্ধতিতে আস্থা হারাচ্ছিলেন তাঁদের মনে পুনরায় আশার সঞ্চার হবে। যাঁরা মানবশিশুর বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির কোনো সম্বন্ধ খুঁজে পান না, তাঁদের মনেও বীরভূমের রোদে পোড়া লাল মাটির দেশের খরা হাওয়া বইতে থাকবে; সেখানকার উন্মুক্ত প্রান্তরের ওপারে দিগন্তের আড়ালে সূর্য ওঠা সূর্য ডোবা তাঁদের চোখেও দেখা দেবে।

সহজ, বিশুদ্ধ, শুনতে মধুর বাংলায় লেখা বইখানি, ঝরঝরে ছাপা, সুন্দর বাঁধাই, প্রচ্ছদ পট দেখলে মন কেমন করে। এমন বই খুব বেশি দেখা যায় না।

লীলা মজুমদার

The Ugly American *By* William J. Lederer and Eugene Burdick. Victor Gollanz Ltd., London. 16*s*.

দু'জন লেখক যুগ্ম-প্রচেষ্টায় একখানা উপন্যাস লিখেছেন। ব্যাপারটা একটু অভিনব। যেমন অভিনবত্ব রয়েছে বইয়ের নামকরণে। কাজেই লেখকদ্বয় সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও একটা সুনির্দিষ্ট প্রত্যাশা নিয়ে বইখানা পড়তে শুরু করেছিলাম। পড়ার পরে দেখলাম আমার সেই প্রত্যাশা পূরোন হয়েছে; অর্থাৎ সাহিত্য-রসিক হিসাবে বইখানার মধ্যে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা করার নেই।

লেখকদ্বয় অবশ্য কী করে গল্প জমিয়ে বলতে হয়ে, কী করে একটি বিশেষত্বকে প্রধান করে চরিত্রগুলোকে আকর্ষণীয় করতে হয় তা জানেন। এই ক্ষমতাগুলো যাঁর নেই তাঁর পক্ষে উপন্যাস লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা। কিন্তু এই গুণগুলি থাকলেই তাঁকে আমরা উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক বলি না। অবশ্য উপন্যাসের মাধ্যমা যাঁর কাছে কোন বিশিষ্ট দলীয় বক্তব্যকে হাজির করার অবলম্বন মাত্র, তাঁর কাছে এ গুণগুলিই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের প্রকৃতি, মন বা হৃদয়-সংক্রান্ত কোন গূঢ়তত্ত্ব বা মানব নিয়তির উপর আলোক নিক্ষেপের জটিল পথে না গিয়ে তিনি সকলের আগে চাইবেন পাঠকের মনোযোগকে আকৃষ্ট করে রাখতে। দলীয় উদ্দেশ্যমূলক বইয়ের উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরই পাঠক সাধারণত আর বইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশের ইচ্ছাবোধ করেন না। সেই অনিচ্ছুক পাঠকের মনকে টেনে ধরে রাখতে পারাটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। আগ্রহ সৃষ্টির বাঁধা পথগুলো জানা থাকলেই যথেষ্ট হয় না; তার প্রয়োগ নৈপুণ্যটাও কষ্ট করে অর্জন করতে হয়। লেখকদ্বয় কষ্ট করেছেন কিনা জানা নেই, কিন্তু আগ্রহসৃষ্টির কৌশলগুলো প্রয়োগে তাঁরা নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস লেখা বৈধ কিনা এ বিতর্ক নতুন করে তুলে লাভ নেই। উদ্দেশ্যমূলক অথচ সার্থক উপন্যাস পৃথিবীতে এত আছে যে উদ্দেশ্যমূলতাকে সঙ্গত রীতি বলে স্বীকার করে নেওয়াই ভাল। কিন্তু উদ্দেশ্যটা যদি দলীয় রাজনীতি সংক্রান্ত হয় বা রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত হয়? রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির মৌলিক তত্ত্ব সম্পর্কে নয়, কোন তত্ত্বাশ্রিত রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতির প্রয়োগ-বিধি সম্পর্কে যদি হয়? সেক্ষেত্রে কি বলব না যে লেখক উপন্যাসের সাধারণ সীমাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছেন? কিন্তু আমার মনে হয় বিতর্কের ভিতর দিয়ে এ-প্রশ্নের মীমাংসায় আসা সহজ নয়। কোন লেখক যদি মনে করেন যে তাঁর বক্তব্যকে প্রবন্ধের মারফৎ প্রকাশ করে তিনি যতজন পাঠকের সামনে হাজির হতে পারবেন, উপন্যাসের মারফৎ তার চেয়ে অনেক বেশী পাঠকের কাছে হাজির হওয়া যায় এবং সেইজন্য তিনি উপন্যাস লেখেন, তবে তাতে আপত্তি করার কার কী অধিকার আছে? তবে এরকম ক্ষেত্রে সমালোচকের সামনে একটা সমস্যা উপস্থিত হয়। এ-ধরনের বই তিনি কী হিসাবে আলোচনা করবেন—উপন্যাস হিসাবে, না বক্তব্য হিসাবে?

আলোচ্য উপন্যাসখানির কথাই ধরা যাক। উপন্যাস হিসাবে এ বই সম্পর্কে যা বলার তা' ইতিমধ্যেই বলেছি। বাকি থাকল বইয়ের বক্তব্য। বইখানা উপন্যাস হিসাবে কোন শ্রেণীর মধ্যে যদিও পড়ে না, তবু এর বক্তব্যটা গুরুত্বপূর্ণ।

লেখকদ্বয় আমেরিকার পররাষ্ট্রনীতির অনুরাগী। ক্রম অগ্রসরমান কমিউনিজমের গতিরোধ করে আমেরিকা যে বিশ্বকে স্বাধীন মানুষের জন্য মুক্ত রাখতে চাইছে লেখকদ্বয়ের

মনে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তাঁরা বিশ্বাস করেন এই সাধু সংকল্প নিয়ে ইউ. এস. আই. এস-এর যে সমস্ত কর্মচারী পৃথিবীময় ছড়িয়ে রয়েছে তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী বাছাই করা হয়নি। তারা বিলাসী, শ্বেতত্বের অহঙ্কারে মত্ত এবং আমলাতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন। যে-রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রীয় কর্মে লিপ্ত শতকরা নিরানব্বুইজন কর্মচারীই শ্বেতজাতির আভিজাত্য সম্বন্ধে বড় বেশী সজাগ বিশ্ববাসীর স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সে দেশের মাথাব্যথা কতখানি আন্তরিক লেখকদ্বয় যে সে-কথা কেন ভেবে দেখেন নি সেইটেই আশ্চর্য। লেখকদ্বয় কয়েকজন উৎসর্গীকৃত প্রাণ আমেরিকানের চরিত্র উপস্থিত করে দেখিয়েছেন কী ভাবে তাঁরা প্রাচ্যের সাধারণ মানুষদের সাথে মিশে তাদের মন থেকে কমিউনিজমের বিষ নির্মূল করতে চেষ্টা করছে। পরিতাপের বিষয় আমলাতান্ত্রিক চক্রান্তে তাদের কার্যকাল অকালেই পরিসমাপ্ত হয়।

যাই হোক বইখানা থেকে আমরা একটি মূল্যবান সংবাদ পাই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যে ইউ. এস. আই. এস-এর অফিস স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য শুধুই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করা নয়। সেগুলো দেশের মধ্যে কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচার এবং সংগঠন পরিচালনা করা, দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করা প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। বই-এ উল্লিখিত বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে এই জাতীয় কার্যকলাপের কিছু কিছু বিবরণ পাই। আলোচ্য বই-এ সংবাদ পরিবেশন করছে যে অপর দেশের সার্বভৌম রাজনৈতিক জীবনের উপর বা তার স্বাধীন ক্রমবিকাশের উপর প্রভাব বিস্তার করতে আমেরিকার 'স্বাধীন' বিবেকে আটকায় না।

বস্তুত অনুন্নত দেশগুলির পক্ষে এই প্রভাব বিস্তারের নীতিটা সাম্প্রতিককালে বিশেষ দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সোভিয়েট এবং আমেরিকা আমাদের দেশের বুকের উপর বসে প্রচারমূলক পত্রিকাদি মুদ্রিত ও প্রচার করছে এবং নামমাত্র মূল্যে তা বিক্রী করছে। এই ব্যাপারগুলি বোধ করি প্রভাব বিস্তারের রাজনীতিরই অংশ। বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ সাংস্কৃতিক আদান প্রদান আর প্রচারের এই বিশেষ ব্যবস্থা বোধ করি ঠিক এক জিনিস নয়।

লেখকদ্বয় বলেছেন যে অনুন্নত দেশগুলির জনসাধারণ দারিদ্র্যের দরুণই কম্যুনিস্ট মতবাদের দিকে ঝোঁকে। এই দেশগুলির উন্নয়নের জন্য আমেরিকা প্রচুর টাকা বরাদ্দও করছে, কিন্তু সে টাকা এমন সব পরিকল্পনায় ব্যয় হচ্ছে যা জনসাধারণের অর্থনৈতিক সমস্যার আশু কোন প্রতিকার করতে পারছে না। প্রাচ্যের গরীব মানুষদের প্রতি দরদী লেখকদ্বয়ের মনে এ-জন্য প্রচুর আপশোষ রয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপারে লেখকদ্বয়ের ঠিক একই রকমের আপশোষ দেখা যায়। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ এবং আণবিক অস্ত্র সরবরাহের জন্য আয়োজিত একটি বৈঠকের ব্যর্থতার চিত্র লেখকদ্বয় খেদের সঙ্গে বিবৃত করেছেন। অস্ত্র সরবরাহও কি গরীব মানুষদের উপকারের জন্য?

চতুর লেখকদ্বয় মাত্র আরেকটি জায়গায় তাঁদের প্রকৃত মনোভাবকে প্রকাশ করে ফেলেছেন। বারবার করে কম্যুনিস্টদের প্রচার কৌশলের তুলনায় আমেরিকার প্রচার কৌশলের দুর্বলতার কথা লেখকদ্বয় অনেক যুক্তি তথ্য দিয়ে উপস্থিত করেছেন। তা সত্ত্বেও যদি আরাম এবং বিলাসিতা-প্রিয় আমেরিকাবাসী তাঁদের কথা না শোনে এই ভয়ে তাঁরা বলছেন, 'If we are not prepared to pay the human price, we had better retreat

to our shores, build fortress America, learn to live without international trade and communications and accept the medeocrity, the low standard of living, and the loom of world communism which will accompany such a move.' তা হলে বিশ্বের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লেখকদ্বয়ের এত দুশ্চিন্তার পেছনে সামান্য একটু স্বার্থের যোগ আছে—আমেরিকার জীবন-যাত্রার উচ্চমান বজায় রাখা এবং সেইজন্য বিশ্বের বাণিজ্যে অগ্রাধিকার স্থাপন করা।

অবশ্য এই প্রভাব বিস্তারের নীতির ফলে অনুন্নত দেশগুলির যে কিছু লাভের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না তা নয়। সাহায্য গ্রহণের মধ্যে অবশ্য বিপদ আছে, কিন্তু সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেও যে আমরা বিপদ এড়াতে পারব এমন নয়। শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি সাহায্য দেওয়ার নাম করে কোন দেশের আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব-বিস্তারের চেষ্টা করবেই। সে-চেষ্টার হাত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং স্বাধীন আত্মবিকাশের অধিকারকে রক্ষা করাই আগামী বছরগুলিতে অনুন্নত দেশগুলির সামনে বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেবে।

মোটের উপর *The Ugly American* পড়ে মনে হল কোন দেশ কোন মত বা পথ গ্রহণ করবে তার দায়িত্ব সে-দেশের জনসাধারণই গ্রহণ করবে—আমেরিকা এ নীতিতে বিশ্বাস করে না। আমেরিকার কাছে স্বাধীনতার অর্থ হল আমেরিকার অনুবর্তিতা। সোভিয়েতের নীতিও যদি অনুরূপ নীতি হয় তবে সেটাও সমান ভয়ের কথা। দেখতে পাচ্ছি বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির দাবা খেলার ঘুঁটিতে পরিণত না হওয়ার সমস্যাই ছোট দেশগুলির সামনে আজকে সবচেয়ে বড় সমস্যা।

বইখানাতে কম্যুনিস্ট কার্যক্রমের অসততা এবং সুবিধাবাদের কথাও কিছু কিছু কাহিনীর মধ্যে দেখানো হয়েছে। যদিও লেখকদ্বয় সত্যের ছায়া অবলম্বন করে লিখেছেন বলে বারবার ঘোষণা করেছেন, তবু তাঁরা পক্ষাবলম্বী বলেই তাঁদের বিবরণ-কে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পাঠকদের বিবেকে বাধবে। সাহিত্যে পক্ষাবলম্বনের নীতির কথা লেনিন-ই এককালে বলেছিলেন। সাহিত্যিক পক্ষাবলম্বী হলে জিনিসটা যে কত হালকা হয়ে পড়ে এই জাতীয় বই পড়লে সেটা বোঝা যায়। ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচ্য বই লেখা। এ-সব দেশের আভ্যন্তরীণ জীবন-যাত্রার বিষয়ে আমরা খুব কমই জানি। লেখকদ্বয় একটি উপন্যাস লিখছেন এবং দাবী করছেন সে উপন্যাস যদিও বানানো গল্প তবু সেগুলোকে আমাদের সরল বিশ্বাসে মেনে নিতে হবে। পাঠকের কাছে এই ধরনের দাবী উপস্থিত করা অনুচিত। সাহিত্য কল্পনার রঙে রঞ্জিত কাহিনী বলেই তার ভিতরে দৈনন্দিন বিতর্কমূলক প্রসঙ্গের কোন এক পক্ষকে প্রতিপন্ন বা অপ্রতিপন্ন করা যায় না। উপন্যাস-লেখককে সর্বদাই দলীয় মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠে প্রচারমূলক মনোভাব ত্যাগ করে সর্ব-মানবের প্রতিভূ হয়ে লিখতে হবে।

কাজেই নিজস্ব কোন মূল্য না থাকলেও আলোচ্য বইখানা মূল্যবান এই অর্থে যে এটা আমাদের মনে অনেকগুলি প্রশ্ন জাগ্রত করে।

অচ্যুত গোস্বামী

The House at Adampur *By* Anand Lall. Denis Dobson, London. 15*s*.

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে আনন্দ লাল আর্থার লাল নামান্তরে প্রতিষ্ঠাবান পুরুষ। ইউনাইটেড নেশনস্‌এ ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধিরূপে তাঁর কর্মখ্যাতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি-উৎসুকের অজানা নয়। কিন্তু সুগৃহীতনামা এই রাজপুরুষ যে স্বনামে একজন উৎসাহী সাহিত্যকর্মীও সে খবর বোধ করি অনেকের জানা নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত "দি হাউস অ্যাট আদামপুর" উপন্যাসে আনন্দ লাল তাঁর সাহিত্য-প্রচেষ্টার যে স্বাক্ষর রেখেছেন, তা হয়তো অনেকের-ই কৌতূহলের কারণ হবে।

অন্যতর ক্ষেত্রে আনন্দ লালের প্রসিদ্ধির কথা স্মরণে ছিল ব'লে "দি হাউস অ্যাট আদামপুর" স্বভাবতঃই কৌতূহলী উৎসাহের সঙ্গে পাঠ করেছিলাম। পাঠান্তে নিতান্তই হতাশ হলাম।

রাজনীতি-উৎসাহী ব'লেই হয়তো আনন্দ লাল আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের একাংশকে তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পটভূমি সম্পর্কে ধারণা স্বচ্ছ না হলে এবং ফলত তার ব্যবহার দুর্বল ও অসার্থক হ'লে কি খেদজনক অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারে আনন্দ লালের উপন্যাস তার চমৎকার নজির রূপে উপস্থাপনীয়। বোঝা যায়, স্বাধীনতা সংগ্রামের হেতুবৃন্দের প্রতি আনন্দ লাল কোনদিনই শ্রদ্ধান্বিত নন, স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ ও মর্মার্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা তিনি কোনদিনই করেননি, ফলে তাঁর উপন্যাস পড়ে ধারণা হয়, স্বাধীনতা সংগ্রাম তাঁর কাছে সামান্য কয়েকটি 'isolated risings' ছাড়া কিছুই নয় কতকগুলি পয়সা-ওয়ালা লোক আবেগের বশে খেয়াল-খুশি মতো যখন-তখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এইসব risings-এ অবতীর্ণ হয়েছিল। পরাধীনতার গ্লানি, বিদেশীদের হাত থেকে মুক্তি পাবার আকুল আকাঙ্ক্ষা, জীবন-পণ সংগ্রাম ও সংগ্রামী চিত্তের উত্তাপ, এক কথায় স্বাধীনতা সংগ্রামের বিন্দুমাত্র উষ্ণতাও এই উপন্যাসে নেই। পরন্তু, বিদেশীদের ও উত্তরকালকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অসম্পূর্ণ ও বিকৃত ছবিই লেখক দিয়ে গেলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন উৎসাহী যোদ্ধা—লেখকের ভাষায় দিল্লীর 'তরুণ রাজনৈতিক নেতা'—জয় সিং এই উপন্যাসের নায়ক। বুদ্ধি-দীপ্ত, সুদর্শন, সকলের প্রশংসা-ভাজন। পেশায় ব্যবহারজীবী, আয় মোটামুটি ভালো। শহরের অনেক বিত্তবান ও প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন পরিবারের সঙ্গে খাতির-পরিচয় আছে, যেমন দেওয়ান রাম নাথের পরিবারের সঙ্গে। রাম নাথের কথা বলি : রাম নাথ ব্রাহ্মণ, দেদার টাকা তাঁর এবং উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া সেই ঐশ্বর্য ইংরেজ সরকারের প্রসাদ-প্রসূত। এই রাম নাথের বাড়ির একটি মঙ্গল-উৎসবে আমাদের সঙ্গে জয় সিং-এর প্রথম সাক্ষাৎ। বলাই বাহুল্য, সেই উৎসবে নিমন্ত্রিতদের সবাই সমাজের উঁচু তলার লোক। জয় সিং-এর পক্ষে শুধু রাজনীতি করলে চলে না, মাঝে-মাঝে হৃদয়ের ধর্মও পালন করতে হয়। সুতরাং রাম নাথের ভাগিনেয়ী সুন্দরী গীতা ও পণ্ডিত ধর্ম দাসের আশ্চর্য রূপসী সপ্তদশী দুহিতা লেনার দিকে তাঁকে দৃষ্টি রাখতে হয় (লক্ষণীয় জয় সিং-এর উভয় প্রেমাস্পদাই রূপৈশ্বর্য-সম্পন্না!)। আর রাম নাথ : টাকা-কড়ি, যশ-প্রতিপত্তিই তো সব নয়, জীবনকে ভোগ না করলে চলবে কেন, সাংসারিক কাজের চাপ থেকে একটু মুক্তি পেলেই তাই রাম নাথের দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সময় মতো সে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পান তাঁর জীবনরসিক জরিফু জমিদার বন্ধু মুজাফ্‌ফর খাঁ, তিনি এসে রাম নাথকে জীবন

দেখাতে নিয়ে যান তাঁর আদামপুরের বাগান-বাড়িতে। খাঁ সাহেবের রক্ষিতা রাণুকে দেখে ব্রাহ্মণ-সন্তান রাম নাথের দৃষ্টির দিগন্ত প্রসারিত হয়, রাম নাথ বুঝতে পারেন তাঁর স্ত্রী সার্থক জননী ও সংসারের পালয়িত্রী হিসাবে শ্রদ্ধার্হা হ'লেও নারী হিসাবে সম্পূর্ণা নন। আদামপুরের বাগান-বাড়ি রাম নাথের উপর মোহিনী প্রভাব বিস্তার করে, মুজাফ্‌ফরের মৃত্যুর পর তিনি তা কিনে নেন এবং নিজের মৃত্যুর আগে 'Good brain and good heart' জয় সিংকে তা দান করে যান।

ছোট বড় নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে উপন্যাসের কাহিনীর এখানেই শেষ। ঘটনাগুলির বেশির ভাগই রাজনৈতিক, স্বাধীনতা সংগ্রাম-সম্পর্কিত এবং প্রায়শঃই পারম্পর্যহীন। ঘটনাগুলি মূল কাহিনীকে তাৎপর্য-মণ্ডিত বা বিভিন্ন চরিত্রের বিকাশ লাভে সহায়তা করার চাইতে আসলে উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়াতেই সাহায্য করেছে। সত্য কথা বলতে গেলে, অর্থবান ও সুদর্শন পাত্রপাত্রীবহুল এই উপন্যাসের মূল কাহিনী-অংশই দুর্বল এবং ততোধিক দুর্বল তার বিন্যাস। উপন্যাসের বক্তব্য কী তা বোঝা দুরূহ। আমার তো মনে হয় বস্তুত ঔপন্যাসিকের কোন বক্তব্য, কোন জীবনদর্শনই নেই এবং তার ফলে তাঁর এ রচনা মননকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে না। যদি চিত্তদ্রাবক গুণে এ উপন্যাসের থাকত, তা হলেও লেখককে ধন্যবাদ জানাতাম। "দি হাউস অ্যাট আদামপুর" উপন্যাসের কোন চরিত্রই সহানুভূতি আকর্ষণ করে না, মুজফ্‌ফর খাঁ, রাম নাথ, গীতা, লেনা কেউ-ই না। জয় সিং-এর জীবনের ব্যর্থতা কিছুটা করুণাসঞ্চারী বটে, কিন্তু তার চরিত্রের দৃঢ়তা বা এমন কোন মহৎ বৈশিষ্ট্য নেই যা আমাদের মনে দাগ কাটে। জয় সিং-এর মতো তরুণ রাজনৈতিক নেতা, যে সকলের বিশেষত গীতা লেনার মতো সুন্দরীদের শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার পাত্র, শেষ পর্যন্ত সেই ভদ্রলোক আনন্দ লালের কলমের দাক্ষিণ্যে এমন নীরস ও নিশ্চরিত্র মানবে পরিণত হলো কী ক'রে ভাবতে অবাক লাগে। আর তখনই মনে হয়, বস্তুত জয় সিং-এর স্রষ্টার-ই নিজস্ব কোন প্রত্যয় বা জীবন-দর্শন নেই; অন্যভাবে উপন্যাসের চরিত্র-সৃষ্টি তাঁর ক্ষমতার বহির্ভূত।

"দি হাউস অ্যাট আদামপুর" কয়েকটি অপরিণত মনের মিলনস্থল। প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক সুপ্রবৃত্তিগুলি যে এখানে অনুপস্থিত এমন নয়, কিন্তু সেই সুপ্রবৃত্তিগুলি শেষ পর্যন্ত কোথাও বাঁচতে পারে নি। প্রমাণ জয়-লেনা ও জয়-গীতা অধ্যায়। লেনা ও জয় পরস্পরের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েছিল, লেনার সমস্ত মন জুড়ে ছিল জয় সিং, জয়েরও চিত্ত অধিকার ক'রে ছিল তন্বী লেনা; জয়ের অসুখে লেনা মূর্তিমতী কল্যাণীর মতো সেবা-শুশ্রূষা করত জয়কে, জয়কে ছেড়ে এক মুহূর্ত থাকা তার পক্ষে যেন অসম্ভব ছিল। এমন গভীর যাদের প্রণয়, দেখা গেলো সামান্য কিছুদিনের মধ্যেই বিনা কারণেই তাদের সম্পর্ক ভেঙে গেলো। প্রকাশ নামে সুগঠিতদেহ এক সেনা-যুবককে দেখে লেনার ভাবান্তর এলো, লেনা নিজে থেকেই বাবা-মা-র সাহায্য প্রার্থনা ক'রে প্রকাশকে বিয়ে ক'রে বসলো। বিবাহ নামীয় সামাজিক বন্ধনের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি কিংবা শরীরী আকর্ষণ কোন্‌টা লেনাকে পূর্বতন প্রণয়াস্পদকে অতি সহজেই ভুলতে প্রবৃত্ত করেছিল? হয়তো দু'টি কারণই এক সঙ্গে ক্রিয়াশীল হয়েছিল। তাহ'লে কী বলতে হবে, আনন্দ লালের ভাষ্যে, মানব-জীবনে প্রকৃত প্রেমের কোন স্থান নেই? আত্মপ্রিয়তাই মানুষের একমাত্র প্রবৃত্তি ও পরিচয়? আনন্দ লালের উত্তর কিছুটা স্পষ্ট হ'য়ে শোনা যায় জয় ও গীতার প্রেম-পর্বে। লেনা পর্ব সমাপ্তির পরে জয় গীতার প্রেমে মগ্ন হ'য়ে পড়ে, গীতাও জয়কে যেন এক

মুহূর্ত চোখ-ছাড়া করতে পারে না। গীতা তার মামা রাম নাথকে জয়ের প্রতি তার নিবিড় ভালোবাসার কথা জানিয়ে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। রাম নাথ জয়ের অব্রাহ্মণত্বের যুক্তিতে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং যে গীতা 'was passionately enamoured of Jai' এবং 'felt completely held by Jai as a lover' সে গীতাই অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে জয়কে মন থেকে মুছে ফেলে লক্ষ্ণৌতে বড়লোক বাবার কাছে ফিরে যায় এবং কিছুদিন বাদে এক ধনাঢ্যকে বিবাহ ক'রে পূর্বতন প্রেমের মূল্য শোধ করে।

অর্থাৎ সারত আনন্দ লাল প্রেমের মহত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করতে রাজি নন। তাঁর প্রত্যয় অনুসারে প্রেম কামনার-ই নামান্তর, শরীরের দাবি মেটানোতেই তার সার্থক সমাপ্তি। রাম নাথের সুদর্শন সেক্রেটারী আমির চাঁদের প্রতি গীতার উত্তেজক আসক্তি ও কামনাকলুষ আচরণ, মুজফফর খাঁর নিছক লাম্পট্য, 'মিস্‌ট্রেস' রাখার প্রয়োজনীয়তাতে রাম নাথের প্রত্যয়, লেনাকে দেখে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আইভর জোন্‌স-এর হৃদয়-বিপ্লবের সূচনা, ইত্যাদি নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে আনন্দ লালের ধারণা পরিস্ফুট করে।

আনন্দ লাল যদি এখানেই ক্ষান্ত হতেন এবং সেই সঙ্গে মানব-চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতর কিছু অংশ রূপায়িত করতে প্রয়াসী হতেন, তাহ'লে স্বস্তিবোধ করা যেত। কিন্তু সে রাস্তাও তিনি বন্ধ করেছেন। কয়েকজন মুনাফালোভী সাবান-প্রস্তুতকারকের অর্থকরী হীন প্রস্তাবে ('dirty deal') রাম নাথের আপত্তি বা গ্রামবাসীদের উপর পাইকারী হারে ধার্য জরিমানা শোধ ক'রে দেওয়া বা জয় সিংকে আদ্যমপুরের জমিদারী দান করার মধ্যে কেউ রাম নাথ-চরিত্রের মহত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারেন কিন্তু এই তিনটি ঘটনা মূল চরিত্রের সঙ্গে অসমঞ্জস এবং তাদের অসংলগ্ন উপস্থাপনার ফলে রাম নাথের চরিত্র খুব একটা উন্নত হয় নি। বস্তুত, তাঁর উপন্যাসের প্রায় সব ক'টি চরিত্রই স্বরচিত চক্রচারী এবং সুবিধাবাদী, আত্মকেন্দ্রিক ও জন-সংযোগ-বিরহিত। উদাহরণত, রাম নাথের গীতার বিবাহ-প্রস্তাবে আপত্তির উল্লেখ করা যায়। জাঠ বংশোদ্ভূত প্রকাশের সঙ্গে ব্রাহ্মণ-কন্যা লেনার বিবাহ রাম নাথ সমর্থন করেন অথচ রাজপুত জয় সিং-এর সঙ্গে গীতার বিবাহে তাঁর যতেক আপত্তি। রাম নাথ নিরাবরণরূপে প্রকাশিত পড়েন নিচের সংলাপাংশে :

Geeta: "But uncle you supported Lena's marriage with Prakash who was a Jat. Jai Singh is a Rajput.....

Ram Nath: "Jai is a Rajput and I know his father has a small piece of land. But you see, all the Brahmins would object. He would not bring us anything. With Prakash it was different. He is very rich and he brings all that to the Brahmins and we Brahmins are used to receive things from the people. In your case, we should just be giving you away. It's impossible."

শুধু রাম নাথ নন, রাম নাথের সমর্থনে লেনার বাবা ধর্ম দাসও প্রকাশের সঙ্গে লেনার বিবাহে আপত্তিকর কিছু দেখেন নি। কেন দেখেন নি তারও কারণ আনন্দ লাল দিয়েছেন। কারণ প্রকাশ অব্রাহ্মণ হ'লেও 'was rich, respectable ; he had a big stake in the land and he was a fairly senior army officer'. সুতরাং 'It could not be illegal for anyone's daughter to marry a man with all that.'

এই 'all that'-ই হয়তো ধর্ম দাসের কন্যাকেও তার স্মৃতি থেকে 'a small piece of land'-এর মালিক এবং মুখ্যত এক রাজনৈতিক কর্মীর ভালোবাসা অনায়াসেই মুছে ফেলতে সাহায্য করেছিল।

পৃথিবীতে ভালো লোকের সংখ্যা কম হ'তে পারে, কিন্তু যত কম আনন্দ লাল ভাবেন, তত কম কী? আর্থার লাল কী বলেন?

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা—মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। পুরোগামী প্রকাশনী। কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

বিংশ শতকের প্রারম্ভে যে কয়জন বাঙালী মনীষী শিল্পকলার চর্চা ও তার তাৎপর্য নিরূপণের প্রয়াস করিয়াছেন, স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁহাদের অন্যতম। পেশায় তিনি ছিলেন পূর্তবিদ, স্বাভাবিক কারণে তাঁহার দৃষ্টি স্থাপত্যকলার মূল তত্ত্ব ও তাৎপর্যের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিল। উড়িষ্যার মন্দির সম্বন্ধে তিনি যে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আজিও তাহা পণ্ডিতসমাজে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত। তাহা ছাড়া ভারতের মূর্তিকলা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর, তাহার প্রমাণ আমরা পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত বিভিন্ন মূর্তির পরিচয়-সম্বলিত তাঁহার রচিত তালিকা-গ্রন্থে।

স্থাপত্যকলার মূল তত্ত্ব নিরূপণে তিনি ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ ঘুরিয়া বিভিন্ন স্থাপত্য-নিদর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যকলা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান ছিল সুগভীর। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থের সহিতও তাঁহার পরিচয় ছিল নিবিড়। স্থাপত্যশিল্পের তত্ত্ব ও তাৎপর্য নিরূপণে অন্ধ দেশপ্রেমের দ্বারা তিনি পরিচালিত হন নাই। যুক্তিবাদী সুদক্ষ পূর্তবিদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় তাঁহার বিভিন্ন রচনাবলীতে সুস্পষ্ট। শিল্পের তাৎপর্য বিশ্লেষণে তাঁহার রচনাভঙ্গীও ছিল অনবদ্য, সর্বসাধারণের পক্ষে সুগম ও সহজবোধ্য।

স্বর্গীয় গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বাংলা ভাষায় রচিত স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধীয় বিভিন্ন প্রবন্ধ গ্রথিত করিয়া "স্থাপত্যশিল্পের ভূমিকা" নামে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানি নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্থাপত্যশিল্পের মূল তত্ত্ব, তাহার সঙ্গতি ও অসঙ্গতি, বিশেষত্ব ও সার্থকতা এবং শিল্পে দেশ কাল ও পাত্রের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থাপত্যের বিশুদ্ধি, তাহার সনাতনত্ব, আকৃতিগত সম্পদ, তাহার মৌলিকতা ও জীবনের সহিত তাহার সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ধর্ম ও স্থাপত্যশিল্পের নিবিড় সম্বন্ধ। চতুর্থ অধ্যায়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক আদর্শান্বিত স্থাপত্যরীতির আলোচনা গ্রন্থকার করিয়াছেন। পরবর্তী অধ্যায় স্থাপত্যের সার্থকতা ও উৎকর্ষ, তাহার রস ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে লেখকের মতামত ব্যক্ত হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে স্থাপত্য ও অলঙ্কার, স্থাপত্যের বৈষম্য ও সামঞ্জস্য, বৈপরীত্য ও সৌন্দর্য এবং সপ্তম অধ্যায়ে স্থাপত্যের আকৃতিগত বৈচিত্র্য প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু স্থাপত্যের সম্পূর্ণতা, তাহার গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা,

শিল্পের উৎকর্ষ বিধানে শিল্পীর দক্ষতা ও কল্পনাশক্তির প্রভাব। সর্বশেষ অধ্যায়ে স্থাপত্যের প্রাণশক্তি ও ব্যঞ্জনাশক্তির আলোচনায় গ্রন্থের সমাপ্তি।

বিভিন্ন অধ্যায়ে লেখক তাঁহার মত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতিটি বিষয়ে তাঁহার আলোচনা যুক্তিসহ এবং সেই কারণে যথেষ্ট মূল্যবান বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। প্রাচীন স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনাকালে তিনি পুরাপ্রিয়তাকে প্রশ্রয় দেন নাই, বরং বলিয়াছেন 'পুরাপ্রিয়তাকে স্থাপত্যের নিয়ন্তা করিলে উহার মর্মস্থলে আঘাত করা হয়।' সংস্কৃতিবান বৈজ্ঞানিকের এই উক্তি এখনকার কালে বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। অপর দিকে আধুনিক স্থাপত্যের ইঁট-কাঠ-লোহা ইত্যাদির যথেষ্ট ব্যবহারে যে অতিকায় সৌধাবলী রচিত হইতেছে তাহার অসঙ্গতির প্রতিও তিনি কটাক্ষ করিয়াছেন। স্থাপত্যের সহিত অলঙ্কারের সম্বন্ধ বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন : 'অলঙ্কার সম্পাদন করিলেই সর্বস্থলে বা সর্বাবস্থায় সৌন্দর্য রক্ষিত হয় না। অলঙ্কার অনেক সময় শোভাবৃদ্ধি না করিয়া উহার তিরোধানে সহায়তা করে।' স্থাপত্যের সার্থকতা তাহার 'রচনা ও অঙ্গসংস্থানে'। 'যে সৌধের আকৃতি ও স্থাপনবিন্যাসগত সৌন্দর্য নাই, অলঙ্কার তাহার কি করিবে?'

বিভিন্ন অধ্যায়ে গ্রন্থকার অনেক সমীচীন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাহার যাথার্থ্য সংস্কৃতিবান বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃতি পাইবে বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের উল্লেখ ও আলোচনা এ স্থলে সম্ভব নয়। আজকালকার শিল্প-সমালোচনারীতির পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থকারের এই সম্বন্ধে একটি মত উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয় : 'শিল্প-সমালোচকেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এক প্রকারের বা সামান্য-সাদৃশ্য-যুক্ত ভিন্ন প্রকারের গৃহায়তন প্রভৃতি দর্শন করিয়া একই প্রভাবের আবিষ্কার করিবার জন্য ব্যগ্র হয়েন। এই সাদৃশ্য মেক্সিকো বা সিংহল বা উত্তর মেরু প্রদেশের যেখানেই দৃষ্ট হউক না, তাঁহাদিগকে প্রভাবের একত্ব বাহির করিবার জন্য উৎসুক করিবেই। প্রভাব একই প্রকারের হইলে ফল-সাদৃশ্য-ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারে, কিন্তু বিপরীত সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে; অর্থাৎ সাদৃশ্য দেখিলেই যে একই প্রভাব অঙ্গীকার করিতে হইবে, যাঁহারা সামান্য তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অনায়াসেই বুঝিবেন যে ইহা কিরূপ যুক্তিবিরুদ্ধ।'

লেখকের যুক্তিবাদী সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় গ্রন্থখানির সর্বত্র বিদ্যমান। রচনাগুলিও যেমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ তেমনি মৌলিকতাগুণে সমৃদ্ধ। স্থাপত্য শিল্পে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয় এই রচনাগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এ সমালোচনার উপসংহারে গ্রন্থটি সম্বন্ধে তাঁহার একটি অভিমত উদ্ধৃতিযোগ্য : ''স্থাপত্য শিল্পের ভূমিকা''য় একটি বিষয়ে পরিচয় লাভ করিয়া আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। স্থাপত্যের সহিত জীবনের, অথবা এক বিশেষ সভ্যতা বা সংস্কৃতির, যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ রহিয়াছে লেখক সে সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। অর্থাৎ স্থাপত্য বিচারে তিনি শুধু স্থপতি বা শিল্পীর মানদণ্ডই ব্যবহার করেন নাই, পরন্তু সংস্কৃতিবিদের মানদণ্ডেরও প্রয়োগ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে সেইজন্য শুধু একজন পণ্ডিত নয়, প্রকৃত বিদগ্ধ সুধীজনের পরিচয় পাওয়া যাইবে।'

সরসীকুমার সরস্বতী